تحفة الدرر في مصطلح اهل الاثر
তুহফাতুদ দুরারি ফী মুছত্বলাহি আহলিল আছারি

মুছত্বলাহুল হাদীছ

শিক্ষায় **মণি-মুক্তা উপহার**

আব্দুল্লাহ **বিন আব্দুর রাযযাক**
ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত
ছাত্র, হাদীছ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব

নিবরাস প্রকাশনী

তুহফাতুদ দুরারি ফী মুছত্বলাহি আহলিল আছারি

মুছত্বলাহুল হাদীছ শিক্ষায় **মণি-মুক্তা উপহার**

আব্দুল্লাহ **বিন আব্দুর রাযযাক**

প্রকাশক
নিবরাস প্রকাশনী
নওদাপাড়া, (আমচত্ত্বর), সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৯৬২-৬২২৫০৭

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১৫ ঈসায়ী
জুমাদিউল উলা ১৪৩৭ হিজরী
ফাল্গুন ১৪২২ বঙ্গাব্দ

নির্ধারিত মূল্য
৪৫/- (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

Tuhfatud Durar Fee Mustalahe Ahlil Aasar, *Written by* ***Abdullah Bin Abdur Razzaque*** *and Published by Nibras Prokashoni, Nawdapara, Rajshahi. Mobile :* ***01962-622507.****Fixed Price :*

সূচীপত্র

***

তুহফাতুদ দুরারি ফি মুছত্বলাহি আহলিল আছারি

হাদীছের পরিভাষা শিক্ষায় **মণি-মুক্তা উপহার**

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শান্তি অবতীর্ণ হোক শেষনবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর। ছাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পর-

হাদীছের ইলম অন্বেষণকারী প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের পবিত্র ও সুরভিত ফুল বাগানে তোমাদেরকে স্বাগতম!!

যারা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের ছাত্র, তারা সত্যিই সম্মানিত। একজন হাদীছের ছাত্র যতক্ষণ হাদীছ অধ্যয়ন করে, ততক্ষণ সে যেন এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে থাকে। যার বাড়ীতে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের বই আছে, রাসূল (ছাঃ) যেন স্বয়ং তার বাড়ীতে কথা বলছেন। তাহলে যাদের জীবন-মরণ রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ, যাদের মন-মগজ শুধু রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে পাগলপারা হয়ে খুঁজে বেড়ায়, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ মুখস্থ করতে, গবেষণা করতে, বুঝতে, অন্যকে বুঝাতে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দুনিয়ার বুকে বাস্তবায়ন করতে যারা নিজেদের জীবন পর্যন্ত মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবান করে দেয়, তারা কতই না মহান!! এক্ষেত্রে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবুদাঊদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ, ইমাম নাসাঈ, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, হাফেয যাহাবী, ইমাম বায়হাক্বী, ইমাম দারাকুৎনী, ইমাম আলবানী প্রমুখ রহিমাহুমুল্লাহ ইতিহাসখ্যাত। যারা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের মহান খাদেম হিসাবে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ।

হে হাদীছ নামক ফুল বাগানের শিক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দ! হাদীছের একজন সম্মানিত ছাত্র হিসাবে তোমাদেরও অবশ্যই লক্ষ্য থাকতে হবে তাঁদের মত খাদেম হওয়ার। অতএব তোমাদেরকেও স্বপ্ন দেখতে হবে। যে স্বপ্ন হবে হাদীছ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার, জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের জ্ঞান অর্জন করার, তদনুযায়ী আমল করার এবং দুনিয়ার বুকে তার যথাযথ বাস্তবায়ন করার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়ার স্বপ্ন।

স্বপ্ন বাস্তবায়নে **যা যরূরী :**

যাদের অন্তরে এই সুপ্ত স্বপ্ন জাগরূক, যারা এই সকল মহান মনীষীর মত হওয়ার স্বপ্ন দেখে, তাদের উদ্দেশ্যে প্রথম কথা হচ্ছে, 'ঘুমের মধ্যে যা দেখা হয়, তা স্বপ্ন নয়; বরং স্বপ্ন তাই, যা বাস্তবায়নের চেষ্টা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না'। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনটি কাজ করা অতীব যরূরী :

(ক) পাপমুক্ত থাকা : কুরআন-হাদীছের জ্ঞান এবং পাপ একসাথে থাকতে পারে না। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর উস্তাদ ইমাম ওয়াকী'কে একদা দুর্বল মুখস্থ শক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে চমৎকার একটি উত্তর দেন। পরবর্তীতে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বিষয়টি কবিতা আকারে উল্লেখ করেন এভাবে,

شَكَوْت إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي.

অর্থাৎ 'আমি একদা ওয়াকি'কে আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে গুনাহের কাজ ছাড়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, জেনে রাখ! নিশ্চয় ইলম হচ্ছে নূর বা জ্যোতি। আর মহান আল্লাহ্‌র নূর কোন পাপিকে দেওয়া হয় না'।[১]

(খ) অত্যধিক পরিশ্রম : পরিশ্রম সফলতার মূল চাবিকাঠি। পরিশ্রম ছাড়া কোন কিছু করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.

অর্থাৎ 'মানুষ যা অর্জন করে তা পরিশ্রমের ফলেই করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

অর্থাৎ 'আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যকক্ষণ তারা নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন না করে' *(রা'দ ১৩/১১)*।

তাইতো শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রায়ই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলে থাকেন, 'মিহনাত কিসি কো ধোকা নাহি দেতী'। অর্থাৎ 'পরিশ্রম কাউকে ফাঁকি দেয় না'। দুনিয়ার সবকিছুই আমাদের ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু পরিশ্রম কখনো ফাঁকি দিবে না। দুনিয়াতে যিনি যত মহান হয়েছেন, তিনি তার পরিশ্রমের বদৌলতেই হয়েছেন। তাই পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই।

(গ) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা : মহান আল্লাহ যদি কাউকে কিছু দিতে চান, তাহলে দুনিয়ার কেউ তা বাধা দিতে পারবে না। আল্লাহ যদি কাউকে কিছু না দিতে চান, তাহলে সমগ্র দুনিয়া একত্র হয়ে চেষ্টা করলেও তা দিতে পারবে না। তাই মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কেঁদেই ইলম নিতে হবে।

একজন 'তালিবে ইলম'-এর বৈশিষ্ট্য :

১. ইখলাছের সাথে ইলম হাছিল করা। ইলম হাছিলের পিছনে দুনিয়া লক্ষ্য থাকলে ঠিকানা জাহান্নাম হতে পারে। আর ইখলাছ থাকলে যে কোন খেদমত আল্লাহ কবুল করবেন।

২. ইলম অনুযায়ী আমল করা। ইলম অনুযায়ী আমল করলে মহান আল্লাহ্‌র কবুলিয়াত পাওয়া যায়।

৩. সফর করা। উচ্চতর ইলম হাছিলের জন্য সফর করা অবশ্য কর্তব্য। সফর করলে ইলম বাড়বেই ইনশাআল্লাহ।

---

১. ইমাম শাফেঈ, দিওয়ানুশ শাফেঈ, তাহক্বীক্ব মুজাহিদ মুছত্বফা (দিমাশক্ব : দারুল কলম), পৃঃ ৭২; সুলায়মান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ওমর আল-বাজীরিমী আশ-শাফেঈ, তুহফাতুল হাবীব আল-শারহিল খত্বীব (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৭/১৯৯৬) ৩/৬৩ পৃঃ।

৪. পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণকে সম্মান করা। শিক্ষকগণকে অসম্মান করলে ইলমে বরকত হয় না।

৫. নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকা।

৬. শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করা। জিজ্ঞেস করা জ্ঞানের অর্ধেক।

৭. দীর্ঘকাল যাবৎ ইলম হাছিলের পিছনে সময় ব্যয় করা। কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ বছর।

৮. স্মরণশক্তি ভাল হওয়া। যদিও স্মরণশক্তি মহান আল্লাহ্র দান, তারপরেও পরিশ্রম করলে, বেশী বেশী মুখস্থ করলে স্মরণশক্তির উন্নতি হয়।

৯. ইলম হাছিলের প্রতি আগ্রহী ও মনোযোগী হওয়া।

১০. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকলে পড়ায় মন বসে না।

কৈফিয়ত :

অধমের লেখা 'হাদীছ তাহক্বীক্বে আলবানী (রহঃ)-এর মতপরিবর্তন : সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ও কারণ বিশ্লেষণ' বইটি পড়ে অনেক ভাই মন্তব্য করেছেন যে, তারা উছূলে হাদীছের পরিভাষা ভালভাবে বুঝতে না পারার দরুণ এই লেখার অনেক কিছুই বুঝতে পারছেন না। তারা আমাকে 'উছূলে হাদীছ' বিষয়ে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করেন। মূলত তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতেই এই বিষয়ে কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ হই।

অত্র বইয়ে সহজ ও সাবলীল ভাষায় উছূলে হাদীছের বিভিন্ন পরিভাষা ও প্রাথমিক মূলনীতি উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য লেখা, সেহেতু মুহাদ্দিছগণের মতদ্বন্দ্ব ও ইলমী পর্যালোচনা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা হয়েছে। শুধুমাত্র একজন প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য যে পরিভাষাগুলো না জানলেই নয়, সেগুলোই আলোচনা করা হয়েছে। বইটি নির্দিষ্ট কোন বইয়ের অনুবাদ নয়, আবার নিজে থেকে লেখা মৌলিক গ্রন্থও নয়। আরবী ও উর্দূ ভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য লিখিত প্রায় সব বইকে সামনে রেখে বইটি সাজানো হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

(ক) নুযহাতুন নাযর- হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী।

(খ) তাইসীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ- ডঃ মাহমূদ আত-ত্বাহ্হান।

(গ) মিন আতইয়াবিল মুনাহ- শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ।

(ঘ) তাইসীরু উলূমিল হাদীছ- সালীম।

(ঙ) আল বায়িছুল হাছীছ- আহমাদ শাকের।

(চ) আল মাদখাল- ইবনু আওযুল্লাহ।

(ছ) তাক্বরীব - ইবনু আওযুল্লাহ।

(ট) উসূলে হাদীছ- ডঃ হামীদুল্লাহ (উর্দূ)।

(ঠ) শারহু নুখবাতিল ফিকার- সাঈদ আহমাদ পালানপুরী (উর্দূ)।

মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমতে বইটি এখন পাঠকের হাতে, ফালিল্লাহিল হাম্দ। আশা করছি প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রসহ যারা উছূলে হাদীছ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান হাছিল করতে চাইবে, এই বইটি তাদের পথপ্রদর্শক ও দিশারীর ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে একটি কথা না বললেই নয়, অত্র বইটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র মদীনায় ‘মসজিদে নববী’র লাইব্রেরীতে বসে লিখা। মহান আল্লাহ্‌র নিকট দু‘আ করছি, আল্লাহ যেন অত্র বইটিকে কবুল করেন এবং ইলমে হাদীছ পিয়াসী সারা বিশ্বের সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ঘরে বইটিকে পৌঁছে দিন। বইটি রচনায় যারা উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম পারিতোষিক কামনা করছি। বইটির মধ্যে তথ্যগত ভুল-ত্রুটি ও অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল। বইটি যেন আমার এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার জান্নাতুল ফেরদাউসের অসীলা হয়-আমীন!!

॥লেখক॥

প্রথম অধ্যায়
(الباب الأول)
প্রাথমিক জ্ঞান
(العلوم الإبتدائية)

হাদীছ সংশ্লিষ্ট ইলমসমূহ :

১- তাদবীনুস সুন্নাহ বা হাদীছ সংকলন (**تَدْوِيْنُ السنَّةِ**) **:** হাদীছ কিভাবে আমাদের নিকট পৌঁছল, এত হাদীছ কারা, কিভাবে ও কোন্ সময়ে জমা করেছেন ইত্যাদি বিষয়ক ইলমকে 'ইলমু তাদবীনিস সুন্নাহ' বা হাদীছ সংকলনের জ্ঞান বলে।

২- হাদীছের প্রামাণিকতা (**حُجِّيَةُ السُنَّةِ**) **:** রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ আমরা কেন মানব, এর দলীল কি, যারা হাদীছকে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস মানতে চায় না, তাদের দলীল এবং সেগুলোর জবাব কি ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর যেই বিষয়ের আলোচনাতে পাওয়া যায়, তাকে 'হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ' বা হাদীছের প্রামাণিকতা সংক্রান্ত ইলম বলে।

৩- ইলমু মুছত্বলাহিল হাদীছ (**عِلْمُ الْمُصْطَلَحِ**) **: যে** শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীছের 'সানাদ' ও 'মাতন' বিশ্লেষণ করতঃ তা গ্রহণীয় হওয়া বা না হওয়া বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকে ইলমু মুছত্বলাহিল হাদীছ বলে। আমাদের অত্র বইটি এই বিষয়ক ইলমের প্রাথমিক পর্যায়ের বই।

৪- ইলমুল জারহ ওয়াত-তা'দীল (عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ): হাদীছের রাবী বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের বিভিন্ন মন্তব্যের ধরণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ, মুহাদ্দিছগণের ব্যবহৃত শব্দের অর্থ ও স্তর নির্ণয় এবং সেই অনুযায়ী হুকুম আরোপের পদ্ধতি ইত্যাদি 'ইলমুল জারহ ওয়াত-তা'দীলে'র মূল আলোচ্য বিষয়।

৫. ইলমুর রিজাল (عِلْمُ الرِّجَالِ) : হাদীছের রাবীদের জীবনী, তাদের জন্ম-মৃত্যু, তাদের শিক্ষক ও ছাত্রের পরিচয়, তাদের স্তর ইত্যাদি আলোচনা করা ইলমুর রিজালের মূল আলোচ্য বিষয়।

৬. ইলমু ফিক্বহিল হাদীছ (عِلْمُ فِقْهِ الْحَدِيْثِ) : সালাফে-ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী হাদীছের অর্থ বিশ্লেষণ, হাদীছ থেকে বিভিন্ন আদাব, হুকুম-আহকাম ও হিকমাত নির্গত করা বিষয়ক জ্ঞানকে 'ইলমু ফিক্বহিল হাদীছ' বলে।

উছূলে হাদীছের ইতিহাস ও এ সম্পর্কিত কিছু বইয়ের পরিচয় (تاريخ أصول الحديث وتعارف بعض الكتب المتعلقة بهذا الفن الجليل) :

হাদীছ সংশ্লিষ্ট ইলমসমূহের অন্যতম হচ্ছে উছূলে হাদীছ বা মুছত্বলাহুল হাদীছ। এক্ষণে আমরা এই শাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ইলমু মুছত্বলাহিল হাদীছ-এর পরিচয় :

যে শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীছের 'সানাদ' ও 'মাতন' বিশ্লেষণ করতঃ তা গ্রহণীয় হওয়া বা না হওয়া বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকে 'ইলমু মুছত্বলাহিল হাদীছ' বলে।

বিষয়বস্তু : হাদীছের সানাদ ও মাতন ।

ফলাফল : এই বিষয়ে জ্ঞান হাছিল করার পর হাদীছের ভাণ্ডার থেকে ছহীহ-যঈফ পৃথক করতে পারা যায়।

উছূলে হাদীছের ইতিহাস :

উছূলে হাদীছের ইতিহাসকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। (ক) উৎপত্তি (খ) ক্রমবিকাশ ও (গ) স্বতন্ত্র শাস্ত্র। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হল :

ক. উছূলে হাদীছের উৎপত্তি :

উছূলে হাদীছের মূল ভিত্তি মূলত কুরআনের একটি আয়াত ও রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا.

'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসেক ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই-বাছাই করার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে নাও' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

প্রখ্যাত ছাহাবী মুগীরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)- কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

'আমার উপর মিথ্যারোপ করা অন্যের উপর মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল তার থাকার জায়গা জাহান্নাম'।[২]

অত্র আয়াত এবং হাদীছই ইলমে হাদীছের মূলভিত্তি। তারপর ছাহাবীগণ (রাঃ)-এর যুগে এই ইলম কিছুটা হলেও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। বিশেষ করে আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে যখন শী'আ ও খারেজী নামের দু'টি ভ্রান্ত ফিরকার আবির্ভাব হয়, তখন ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হাদীছ বর্ণনাকারী সম্পর্কে যাচাই-বাছাই শুরু করেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلا يَقُولُ : قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَةَ والذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلا مَا نَعْرِفُ.

'যখনই আমরা কোন ব্যক্তিকে দেখতাম যে, সে বলছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তখন আমরা চোখ-কান খাড়া করে তার কথা শুনতাম। কিন্তু যখন মানুষ ভাল-মন্দ মিশ্রিত করে বলতে লাগল, তখন আমরা আমাদের জ্ঞাত বিষয় ছাড়া গ্রহণ করতাম না'।[৩]

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন,

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

'জনগণ হাদীছের সানাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনা সৃষ্টি হল তখন তারা বলতে লাগল, তোমরা হাদীছের বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। যদি লক্ষ্য করা যেত যে, তারা আহলেসুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হত। কিন্তু বিদ'আতীদের অন্তর্ভুক্ত হলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হত না'।[৪]

খ. উছূলে হাদীছের ক্রমবিকাশ :

রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবী (রাঃ)-এর যুগে ভিত্তি পাওয়া উছূলে হাদীছ পরবর্তীতে তাবেঈদের যুগে সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব, হাসান বাছরী, আমীর শা'বী রহিমাহুমুল্লাহগণের হাত ধরে এবং তাবে' তাবেঈগণের যুগে সুফিয়ান

---

২. ছহীহ বুখারী হা/১২৯১; ছহীহ মুসলিম হা/৫ 'রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করার ভয়াবহতা' অনুচ্ছেদ-২, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩. ছহীহ মুসলিম হা/২১ 'যঈফ রাবীর হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং হাদীছ সংগ্রহের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ-২, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪. ছহীহ মুসলিম হা/২৭ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ছাওরী, ইমাম মালেক, ইমাম আওযাঈ ও আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক প্রমুখ রহিমাহুমুল্লাহগণের সান্নিধ্য পেয়ে তার অগ্রযাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উছূলে হাদীছকে অলিখিত অবস্থা থেকে সর্বপ্রথম কলমের কালিতে বন্দি করেন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) (মৃত ২০৪ হিঃ)। অত্র যুগে আরো অনেক মুহাদ্দিছ উছূলে হাদীছের বিভিন্ন মাসআলার উপর তাদের বিভিন্ন বইয়ে আলোচনা করেছেন। তবে সেগুলো কোনটিই উছূলে হাদীছের উপর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ছিল না। যেমন :

(১) কিতাবুল উম্ম ও কিতাবুর রিছালা : ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর এই গ্রন্থদ্বয়ে উছূলে হাদীছ ও উছূলে ফিক্বহের বিভিন্ন মাসআলার উপর আলোচনা করেছেন।

(২) মুকাদ্দিমা ছহীহ মুসলিম : ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ছহীহ মুসলিমের ভূমিকা। অত্র ভূমিকাতে তিনি উছূলে হাদীছের বিভিন্ন মাসআলার উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।

(৩) আল-ইলালুছ ছাগীর : ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাঁর সুনানে তিরমিযীর শেষে এই ছোট্ট লেখাটি যোগ করেছেন। অত্র প্রবন্ধে উছূলে হাদীছের বিভিন্ন মূলনীতির উপর ইলমী আলোচনা করেছেন।

(৪) রিছালা : ইমাম আবুদাঊদের একটি চিঠি, যা তিনি মক্কাবাসীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সংকলিত সুনানে আবীদাঊদের সংকলন পদ্ধতি, হাদীছের ধরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর অত্র চিঠিতে তিনি আলোচনা করেছেন।

গ. স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে মুছত্বলাহুল হাদীছ :

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর মতে উছূলে হাদীছের উপর সর্বপ্রথম লিখিত আলাদা গ্রন্থ হচ্ছে 'আল-মুহাদ্দিছুল ফাছিল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়াঈ', যা আল-হাসান ইবনু আব্দুর রহমান আল-খাল্লাদ আর-রামাহুরমুযী (মৃত ৩৬০হিঃ) কর্তৃক প্রণীত।[৫]

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্যাবলী :

ক. অত্র গ্রন্থে তিনি রাবীগণের হাদীছ বর্ণনার বৈশিষ্ট্য, হাদীছ শ্রবণের যোগ্যতা, গুণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

খ. বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যকে সানাদসহ সংকলন করেছেন।

গ. বইটি অধ্যায় ভিত্তিক সাজিয়েছেন।

ঘ. বইটি উছূলে হাদীছের উপর লিখিত প্রথম পৃথক গ্রন্থ, যদিও উছূলে হাদীছের সকল মাসআলা তাতে স্থান পায়নি।

এরপর ধীরে ধীরে উছূলে হাদীছের উপর আরো স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। তবে আমরা পৃথক ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের যুগকে দুইভাগে ভাগ করতে পারি। (১) মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহের পূর্ববর্তী যুগ (২) মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহের পরবর্তী যুগ। যেমন-

ইবনুছ ছালাহ (রহঃ)-এর পূর্ববর্তী যুগে লিখিত অন্যতম গ্রন্থগুলো হচ্ছে :

(ক) মা'রেফাতু উলূমিল হাদীছ (مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ)- ইমাম হাকেম (মৃত ৪০৫ হিঃ)

(খ)জুযউন ফী উলূমিল হাদীছ (جُزْءٌ فِيْ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ)- আবু আমর আদ-দানী (মৃত ৪৪৪ হিঃ)

(গ) আল-কিফায়া ফী মা'রেফাতি উছূলি ইলমির রিওয়ায়াহ (اَلْكِفَايَةُ فِيْ مَعْرِفَةِ أُصُوْلِ عِلْمِ الرِّوَايَةِ)-খত্বীব বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিঃ)

---

৫. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, নুযহাতুন নাযর (রিয়াদ : সাফীর প্রকাশনী), পৃঃ ৩১।

(ঘ) আল-ইলমা‘ ইলা মা‘রেফাতি উছূলির রিওয়ায়াতি ওয়া তাক্বয়ীদিস সামাঈ (اَلْإِلْمَاعُ إِلَي مَعْرِفَةِ أُصُوْلِ الرِّوَايَةِ وَتَقْيِيْدِ السَّمَاعِ)-কাযী ইয়ায (মৃত ৫৪৪ হিঃ)।

(ঙ) মা লা ইয়াসাউল মুহাদ্দিছ জাহলুহু (مَا لَا يَسَعُ الْمُحَدِّثَ جَهْلُهُ)- আবু হাফছ আল-মাইয়ানজি (মৃত ৫৮০ হিঃ)।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নিম্নে তিনটি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী পেশ করা হল :

(এক) মা‘রেফাতু উলুমিল হাদীছ (مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ) **:**

ক- ইমাম হাকেম (রহঃ) সর্বপ্রথম অত্র বইয়ে এই শাস্ত্রকে ‘উলূমুল হাদীছ’ নামকরণ করেন।

খ- বইটিতে ইমাম হাকেম (রহঃ) ইলমে হাদীছের সাথে সংশ্লিষ্ট ৫২টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

গ- অত্র বইয়ে প্রতিটি বিষয়কে তিনি ‘নাউ’ তথা প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন।

ঘ- এটিকে উছূলে হাদীছের উপর লিখিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা চলে।

ঙ- হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর মতে বইটি পূর্ণাঙ্গ হলেও তিনি সুন্দরভাবে সাজাতে পারেননি।[৬]

(দুই) আল-কিফায়া ফী মা‘রেফাতি উছূলি ইলমির রিওয়ায়াহ (اَلْكِفَايَةُ فِيْ مَعْرِفَةِ أُصُوْلِ عِلْمِ الرِّوَايَةِ)**:**

প্রথমতঃ বলে নেওয়া উচিত যে, ইলমে হাদীছের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কোন বিষয় নেই, যে বিষয়ে খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) আলাদা কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেননি। খত্বীব বাগদাদী (রহঃ)-এর পরবর্তী সকল মুহাদ্দিছ ইলমে হাদীছ বিষয়ে তাঁর উপর নির্ভরশীল। বলা চলে, তিনিই ইলমে হাদীছকে পূর্ণতা দিয়েছেন। অত্র বইটি তাঁরই লিখিত একটি চমৎকার কিতাব। যেখানে উছূলে হাদীছের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। নিম্নে বইটির কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল :

ক. অত্র বইয়ে লেখক জারহ ও তা‘দীলের মূলনীতি এবং হাদীছ ছহীহ ও যঈফ হওয়ার বিভিন্ন মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

খ. তাদলীস ও মুরসাল হাদীছের হুকুমের উপর বিস্তর আলোচনা করেছেন।

গ. হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনার নিয়ম-পদ্ধতি আলোচনা করেছেন।

ঘ. বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যকে সানাদ সহ জমা করেছেন।

(তিন) মা লা ইয়াসাউল মুহাদ্দিছ জাহলুহু (مَا لَا يَسَعُ الْمُحَدِّثَ جَهْلُهُ)**:**

অত্র বইয়ের উপর মুহাদ্দিছগণ অনেক তানক্বীদ করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

(ক) বইটিতে উছূলে হাদীছের তেমন কোন আলোচনা নেই।

(খ) সাজানো-গোছানো নয়।

(গ) ছোট বই হওয়া সত্ত্বেও তাহক্বীক্ব ছাড়াই জাল ও যঈফ হাদীছে ভরপুর। যা একজন মুহাদ্দিছের শানে মানায় না।

নোট : উছূলে হাদীছের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা শুরু হলেও কোন কোন মুহাদ্দিছ তাঁদের অন্য বিষয়ে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের অধীনে উছূলে হাদীছের উপর অনেক চমৎকার ও সারগর্ভ লেখা উপহার দিয়েছেন। যেমন : মুওয়াত্তা মালেকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘আত-তামহীদে’র ভূমিকাতে ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) উছূলে হাদীছের বিভিন্ন মূলনীতির উপর

---

৬. আসক্বালানী, নুযহাতুন নাযর (রিয়াদ : সাফীর প্রকাশনী), পৃঃ ৩২।

অসাধারণ আলোচনা করেছেন। তেমনি শেষ যুগে এসে শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) তাঁর লিখিত জামে' তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র ভূমিকাতে ইলমে হাদীছের বিভিন্ন দিকের উপর বেনযীর আলোচনা করেছেন। যা হাদীছ শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের অনেক উপকারী।

মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ : উছূলে হাদীছ শাস্ত্রে বিপ্লব

ইমাম ইবনুছ ছালাহ (রহঃ)। মূল নাম আবু আমর ওছমান ইবনু আব্দির রহমান (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ)। ৬ষ্ঠ শতাব্দী হিজরীতে আগত এই মুহাদ্দিছ উছূলে হাদীছ নামক শাস্ত্রটিকে পূর্ণতা দেওয়ার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব নিয়ে আসেন। তিনি দিমাশক্বের মাদরাসা আশরাফিয়াতে নিয়মিত উছূলে হাদীছের উপর দারস প্রদান করতেন। এ সময় তিনি ছাত্রদেরকে উছূলে হাদীছের বিভিন্ন মাসআলা লিখিয়ে দিতেন। ছাত্রদের দ্বারা লিখানো সেই দারসই তার বিখ্যাত গ্রন্থ উলূমুল হাদীছ, যা 'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ' নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

মুকাদ্দিমার বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(ক) অতীতে লিখিত উছূলে হাদীছ ও উছূলে ফিক্বহের বইয়ে সংকলিত প্রায় সকল তথ্যকে তিনি সন্নিবেশিত করেছেন। বিশেষ করে খত্বীব বাগদাদীর সকল কিতাবের সারনির্যাস একত্রিত করেছেন। ফলে তার কিতাবটি হাদীছ শাস্ত্রের ইমামে পরিণত হয়েছে।

(খ) বইটির শুরুতে তিনি চমৎকার একটি ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন।

(গ) অত্র বইয়ে হাদীছ শাস্ত্রের ৬৫ প্রকার বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন।

(ঘ) বিভিন্ন পরিভাষার প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করেছেন। আবার অনেক পরিভাষাকে সংজ্ঞায়িতও করেছেন।

(ঙ) মুহাদ্দিছগণের বিভিন্ন মন্তব্যের বিশ্লেষণ করতঃ মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোতে নিজস্ব তাহক্বীক্ব অনুযায়ী কোন একটি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

গ্রন্থটির বিভিন্ন রূপ :

'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ' গ্রন্থটি ওলামায়ে কেরামের মাঝে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সেজন্য অনেক আলেমই তাঁর বইয়ের খেদমতকে গর্বের মনে করে থাকেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী থেকে শুরু করে ইমাম নববী, ইমাম সুয়ূত্বী ও ইমাম ইবনু কাছীরের মত জগদ্বিখ্যাত ইমামগণ মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহের বিভিন্নভাবে খেদমত করেছেন। নিম্নে 'মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহে'র উপর সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের কাজের একটা সংক্ষিপ্ত রূপ পেশ করা হল :

ব্যাখ্যা :

মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহের এখন পর্যন্ত প্রায় তিনটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যথা-

(১) আল-জাওয়াহিরুছ ছিহাহ ফী শারহি উলূমিল হাদীছ লি ইবনিছ ছালাহ : এটি ইমাম ইবনু জামা'আ-এর সুযোগ্য পুত্র আব্দুল আযীয কতৃক প্রণীত। যদিও গ্রন্থটি এখনো অপ্রকাশিত।

(২) আশ-শাযা আল-ফাইয়্যাহ মিন উলূমি ইবনিছ ছালাহ : উক্ত গ্রন্থের লেখক শায়খ বুরহানুদ্দীন আল-আবনাসী (মৃঃ ৮০২ হিঃ)।

(৩) মাহাসিনুল ইছতিলাহ : গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-বুলক্বিনী। অত্র গ্রন্থে ইমাম বুলক্বিনী ইবনুছ ছালাহের বইয়ে অনুল্লেখিত অনেক তথ্য সংযুক্ত করেছেন। বইয়ের শেষে নতুন ৫টি বিষয় যোগ করেছেন, যা ইবনুছ ছালাহের বইয়ে ছিল না। এছাড়া অনেক জায়গায় ইবনুছ ছালাহ (রহঃ)-এর বিভিন্ন মন্তব্যের সমালোচনাও করেছেন।

কবিতায়ন :

ইমাম ইবনুছ ছালাহের মুকাদ্দিমার গ্রহণযোগ্যতা এতই বেড়ে যায় যে, ছাত্রদের মুখস্থের সুবিধার জন্য অনেক মুহাদ্দিছ বইটিকে কবিতা আকারে সজ্জায়িত করেন। তন্মধ্যে দু'টির পরিচয় নিম্নে পেশ করা হল :

(এক) আলফিয়াতুল ইরাক্বী : মূল নাম 'আত-তাযকিরাহ ওয়াত-তাবছিরাহ'। লেখক- হাফেয যাইনুদ্দীন আল-ইরাক্বী (রহঃ)। ইবনুছ ছালাহের মুকাদ্দিমার উপর লিখিত কবিতাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। পরবর্তীতে ইরাক্বী (রহঃ) নিজেই আবার তাঁর এ কবিতার ব্যাখ্যা লিখেন। এছাড়া ইমাম সাখাবী (রহঃ)ও 'ফাৎহুল মুগীছ' নামে অত্র কবিতার ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। ফাৎহুল মুগীছ নামের এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মুহাদ্দিছগণের নিকটে অনেক উঁচু মর্যাদা পায়।

(দুই) আলফিয়াতুস সুয়ূত্বী : ইমাম সুয়ূত্বীও মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহকে কবিতায় রূপ দেন। অবশ্য তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে মুকাদ্দিমার সকল তথ্য জমা করার পাশাপাশি ইরাক্বী (রহঃ) প্রদত্ত নতুন তথ্যও জমা করেছেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও অনেক তথ্য সংযোজন করেছেন।

সংক্ষিপ্তকরণ :

(ক) ইরশাদু তুল্লাবিল হাক্বায়িক্ব : ইমাম নববী (রহঃ) মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহকে সংক্ষিপ্ত করে এই বইটি রচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজে আবার নিজের বইকে সংক্ষিপ্ত করেন। নাম দেন 'তাক্বরীব ওয়া তাইসীর লি মা'রেফাতি সুনানিল বাশীর ওয়ান-নাযীর'। এরপর ইমাম সুয়ূত্বী অত্র তাক্বরীবের ব্যাখ্যা লেখেন, যার নাম দেন 'তাদরীবুর রাবী শারহু তাক্বরীবিন নাবাবী'। ইমাম সুয়ূত্বীর এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি পৃথিবীব্যাপী অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পায়। বর্তমানে উছূলে হাদীছের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয় তাদরীবুর রাবীকে। পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর হাদীছ শিক্ষার জন্য বইটির পাঠ অপরিহার্য।

(খ) ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ : বিখ্যাত তাফসীরকারক ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহকে সংক্ষিপ্ত করে অত্র বইটি লিখেন। পরবর্তীতে বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আহমাদ শাকের 'আল-বায়িসুল হাছীছ' নামে অত্র বইটির ব্যাখ্যা লিখেন। আহমাদ শাকের (রহঃ)-এর অত্র ব্যাখ্যার উপর ইমাম আলবানী (রহঃ) ও হাফেয যুবাইর আলী যাঈ (রহঃ) টীকা লিখেছেন।

(গ) আল-মুক্বনি' ফী উলূমিল হাদীছ : উক্ত গ্রন্থটি মুক্বাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহের সংক্ষিপ্তকরণ হিসাবে শায়খ সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন (মৃত ৮০৪ হিঃ) রচনা করেন।।

তানক্বীদ বা সমালোচনা :

মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক । যার খেদমত যত বেশী, তার ভুল ধরা হয় তত বেশী। তেমনি ইমাম ইবনুছ ছালাহ (রহঃ)-এর বইয়ের অনেক মুহাদ্দিছ সমালোচনা করেছেন। সমালোচনামূলক বিখ্যাত তিনটি বইয়ের নাম নিম্নে পেশ করা হল :

ক. ইছলাহু ইবনিছ ছালাহ : গ্রন্থটির রচয়িতা আলাউদ্দীন মুগলত্বঈ (মৃঃ ৭৬২ হিঃ)।

খ. আত-তাক্বয়ীদ ওয়াল ইযাহ : হাফেয যাইনুদ্দীন আল-ইরাক্বী (রহঃ) (মৃত ৮০৬ হিঃ) উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

গ. আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমা ইবনিছ ছালাহ : হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) বর্তমান কিছু প্রকাশনী আবু মু'আয তারেক্ব ইবনে আওয়ুল্লাহ-এর তাহক্বীক্বে মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ এবং তার উপর আসক্বালানী ও ইরাক্বী (রহঃ)-এর তানকীদসহ তিনটি বইকে জমা করে একত্রে প্রকাশ করেছে, যা তালিবুল ইলমদের জন্য অনেক উপকারী।

সারর্মম : উপরিউক্ত আলোচনাতে অবশ্যই স্পষ্ট হয়েছে যে, মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ একটি মূল্যবান ও উঁচু মাপের উছূলে হাদীছের কিতাব। সুতরাং প্রতিটি ত্বলিবে ইলমে হাদীছের বইটি পড়া ও সেটাকে নিয়ে গবেষণায় রপ্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

৭ম শতাব্দী হিজরী থেকে বর্তমান যুগ :

এই যুগকে আমরা মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ-এর পরবর্তী যুগ বলতে পারি। নিম্নে এই সময়ের মধ্যে লিখিত কিছু বিখ্যাত ও উপকারী বইয়ের নাম-পরিচয় পেশ করা হল :

(১) আল-ইক্বতিরাহ লি বায়ানিল ইছত্বিলাহ (اَلْإِقْتِرَاحُ لِبَيَانِ الْإِصْطِلَاحِ)- বিখ্যাত ইমাম ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃঃ ৭০২ হিঃ) (রহঃ) গ্রন্থটির প্রণয়নকারী।

(২) আল-মুক্বিযাতু ফী ইলমি মুছত্বলাহিল হাদীছ(اَلْمُوْقِظَةُ فِيْ عِلْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيْثِ)- হাফেয ইমাম যাহাবী (মৃঃ৭৪৮ হিঃ) উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা।

(৩) তাওযীহুল আফকার লি মা'আনি তানক্বীহুল আনযার (تَوْضِيْحُ الْأَفْكَارِ لِمَعَانِي تَنْقِيْحُ الْأَنْظَارِ)- উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত ইমাম ছান'আনী (মৃঃ ৮৪০ হিঃ) ।

(৪) নুখবাতুল ফিকার (نُخْبَةُ الْفِكَرِ)- হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন।

(৫) আত-তাযকিরাতু ফী উলূমিল হাদীছ (اَلتَّذْكِرَةُ فِيْ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ)- শায়খ ইবনুল মুলাক্কিন হলেন উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা।

(৬) আল-মানযূমা আল-বায়কূনিয়্যাহ (اَلْمَنْظُوْمَةُ الْبَيْقُوْنِيَّةُ)- ওমর ইবনু মুহাম্মাদ আল-বাইকূনী।

(৭) ক্বওয়াঈদুত তাহদীছ (قَوَاعِدُ التَّحْدِيْثِ)- জামালুদ্দীন আল-ক্বাসেমী।

(৮) তাওযীহুন নাযর ইলা উছূলিল আছার (تَوْضِيْحُ النَّظْرِ إِلَي أُصُوْلِ الْأَثَرِ)- তাহির আল-জাযায়িরী।

(৯) যফারুল আমানী (ظُفْرُ الْأَمَانِيِّ)- আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী, তাহক্বীক্ব- আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ।

(১০) ক্বওয়া'ইদ ফী উলূমিল হাদীছ (قَوَاعِدُ فِيْ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ) - জাফর আহমাদ থানভী।

(১১) ইছলাহুল ইছত্বিলাহ (إِصْلَاحُ الْإِصْطِلَاحِ)- শায়খ তারেক্ব ইবনু আওয়ুল্লাহ। সম্মানিত লেখকের লিখিত উছূলে হাদীছ বিষয়ক আরো দু'টি চমৎকার কিতাব রয়েছে। তাহল- ক. তাক্বরীব খ. মাদখাল।

(১২) তাইসীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ (تَيْسِيْرُ مُصْطَلَحِ الْحَدِيْثِ) - ড. মাহমূদ আত-ত্বাহহান।

(১৩) তাহরীরু উলূমিল হাদীছ (تَحْرِيْرُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ) - আল্লামা জুদাঈ।

(১৪) আল-ওয়াসীত্ব ফী উলূমিল হাদীছ (اَلْوَسِيْطُ فِيْ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ) - শায়খ আবু শাহবা।

নিম্নে উপরোল্লেখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ৬টি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হল :

(এক) নুখবাতুল ফিকার (نُخْبَةُ الْفِكَرِ):

৭ম শতাব্দী হিজরীতে জন্ম নেয়া হাদীছ শাস্ত্রের মহান ইমাম হাফিযুল হাদীছ ও হাফিযুদ দুনিয়া হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর মাত্র দুই-তিন পৃষ্ঠার বই এটি। মাত্র দুই-তিন পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পুরো উছূলে হাদীছকে সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই কয়েকজন আলেম তাঁর এ বইটির ব্যাখ্যা লিখেন। তন্মধ্যে কামালুদ্দীন আশ-শুমুন্নী (রহঃ)-এর লেখা 'নাতীজাতুন নাযা'র এখনো পাওয়া যায়। এটাকেই 'নুখবাতুল ফিকারে'র প্রথম লিখিত ব্যাখ্যা হিসাবে ধরা হয়। হাফেয (রহঃ) যখন দেখলেন, মানুষ তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর বইয়ের ব্যাখ্যা

লিখছেন, তখন তিনি ভাবলেন, বাড়ীর মালিকই ভাল জানে তার বাড়ীতে কি আছে। সুতরাং তাঁর বইয়ের ব্যাখ্যা তাঁর চেয়ে ভাল কেউ বুঝতে পারবে না। তাই তিনি ছাত্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেই নিজের লিখিত বইয়ের ব্যাখ্যা লিখলেন। নাম দিলেন 'নুযহাতুন নাযার'। তাঁর এই 'নুযহাতুন নাযার' গ্রন্থটি বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ের উছূলে হাদীছের বই হিসাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। সত্যিকার হাদীছের ছাত্রগণ পুরো বইকে মুখস্থ করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর উক্ত বই ও তাঁর ব্যাখ্যার উপর অনেক কাজ হয়েছে। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) 'নুখবাতুল ফিকারে'র ব্যাখ্যা লিখেছেন। অনেকেই টীকা লিখেছেন। অনেকেই কবিতা আকারে সাজিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, হাফেয (রহঃ)-এর মূল গ্রন্থটি ও তার ব্যাখ্যা উভয়রই বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

(দুই) আল-মানযূমা আল-বায়কূনিয়্যাহ (اَلْمَنْظُوْمَةُ الْبَيْقُوْنِيَّةُ):

ইমাম বায়কূনীর কবিতা আকারে লিখিত মুছত্বলাহুল হাদীছের এই বইটি আরব ছাত্রদের নিকটে খুব প্রিয়। তারা তাদের উছূলে হাদীছের উপর শিক্ষা এই কবিতা মুখস্থ করার মাধ্যমেই শুরু করে থাকে। এই বইটিও মুহাদ্দিছগণের মাঝে এতটা প্রসিদ্ধ পায় যে, বহু আলেম-ওলামা এর ব্যাখ্যা লিখেছেন। তন্মধ্যে শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন ও ইমাম যারক্বানীর লেখা ব্যাখ্যা অন্যতম। অত্র কবিতার ব্যাখ্যার অনুবাদ বাংলা ভাষাতেও হয়েছে। শায়খ ছানাউল্লাহ নাযীর আহমাদের অনুবাদে ও শায়খ যাকারিয়ার সম্পাদনায় বইটি 'ইসলাম হাউজ' ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

(তিন) ক্বওয়া'ইদ ফী উলূমিল হাদীছ (قَوَاعِدُ فِيْ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ) :

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর দিক-নির্দেশনায় জা'ফর আহমাদ থানভী অত্র বইটি লেখেন। বইটি মূলত থানভী প্রণীত বিখ্যাত বই 'ঈলাউছ সুনানে'র ভূমিকা। উছূলে হাদীছের বই হিসাবে বইটিকে চমৎকারই বলা চলে, কিন্তু বইটিতে নির্দিষ্ট মাযহাবপ্রীতির কারণে জমহূর মুহাদ্দিছগণের অনেক উছূল প্রাধান্য পায়নি। সেজন্য শায়খ যুবাইর আলী যাঈ বইটি সম্পর্কে বলেন, 'বইটি মূলত ক্বাওয়াঈদুদ দেওবান্দিয়ীন ফী উলূমিল হাদীছ'। অর্থাৎ দেওবান্দীগণের মতানুযায়ী উছূলে হাদীছ। পাকিস্তানের শায়খ বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী অত্র বইয়ে উল্লেখিত ত্রুটিযুক্ত মূলনীতিগুলোর পর্যালোচনা করে একটি চমৎকার বই লিখেছেন। নাম দিয়েছেন 'নাক্বয ক্বাওয়াঈদি উলূমিল হাদীছ'। এছাড়া মাওলানা থানভীর লিখিত ঈলাউছূ সুনানে তিনি যে সমস্ত ত্রুটিযুক্ত মূলনীতির আলোকে হাদীছের বিশ্লেষণ পেশ করেছেন, তার উপরেও পাকিস্তানের শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারী প্রণীত 'ঈলাউছূ সুনান ফিল মীযান' নামে একটি উপকারী ও খুব প্রয়োজনীয় বই রয়েছে।

(চার) ক্বওয়া'ইদুত তাহদীছ ও তাওজীহুন নাযর (قَوَاعِدُ التَّحْدِيْثِ وِتَوْجِيْهُ الَّنظَرِ) :

উছূলে হাদীছের উপর লেখা এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বই বলা চলে উপরের বই দু'টিকে। প্রথমটির লেখক সিরিয়ার জামালুদ্দীন ক্বাসেমী এবং দ্বিতীয়টির লেখক শায়খ তাহের আল-জাযায়িরী। 'তাওযীহুন নাযারে' শায়খ জাযায়েরী পুরো উছূলে হাদীছ শাস্ত্রকে জমা করেছেন। প্রতিটি মাসআলার উপর বিস্তর বাহাছ করেছেন। নিজস্ব তাহক্বীক্বও পেশ করেছেন। এই বইটি থেকে শুধুমাত্র মুহাদ্দিছগণ উপকার লাভ করতে পারেন। অন্যদিকে জামালুদ্দীন ক্বাসেমী তাঁর 'ক্বাওয়াঈদ্‌ত তাহদীছে' সকল মাসআলাকে জমা করেছেন, কিন্তু চমৎকারভাবে সংক্ষিপ্ত করেছেন। সুন্দরভাবে অধ্যায় বিন্যাস করেছেন। ছাত্রদের জন্য বইটি অনেক উপকারী।

(পাঁচ) তাইসীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ (تَيْسِيْرُ مُصْطَلَحِ الْحَدِيْثِ) :

এটি প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাবলীল আরবী ভাষায় লিখিত চমৎকার একটি বই। বইয়ের লেখক বইটিকে প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়ে ছাত্রদের জন্য আরো সহজ করে দিয়েছেন। ফলে এটিকে হাদীছ শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে চমৎকার বই বলা চলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(الباب الثاني)

কতিপয় যরুরী পরিভাষা

(بعض المصطلحات الهامة)

◈ সানাদ ও মাতন (السند والمتن) :

‘সানাদ’-এর পরিচয় :

ছাদ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য যেমন সিঁড়ি লাগে, তেমনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য মানব সিঁড়ি লাগে। মানুষের এই সিঁড়িকেই মূলত ‘সানাদ’ বলা হয়।

উদাহরণ : মনে কর! আমাকে আব্দুর রহমান নামের একজন এসে বলল, ‘আপনি কি জানেন, আজ কাশিমপুর গ্রামের মাহমূদ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে’?। আমি বললাম, ‘তুমি কিভাবে জানলে’? সে বলল, ‘আমাকে আল-আমীন বলেছে। তাকে নাকি মাহমূদের পাশের বাড়ীওয়ালা যুবায়ের বলেছে’।

স্নেহের ছাত্ররা! এই যে সংবাদটা আব্দুর রহমান, আল-আমীন ও যুবায়ের নামের তিনজন ব্যক্তির মাধ্যমে আমার নিকট পৌঁছল, এই তিনজন ব্যক্তির সমষ্টিকেই ‘সানাদ’ বলা হয়।

‘মাতন’-এর পরিচয় :

মানব সিঁড়ির উপর ভিত্তি করে আমরা যে সংবাদ পাই, তাকেই ‘মাতন’ বা মূল টেক্সট বলে। যেমন উপরিউক্ত উদাহরণে ‘কাশিমপুর গ্রামের মাহমূদ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে’ এই অংশটুকু মাতন ।

সারর্মম :

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সহ হাদীছের সংকলকগণের নিকটে হাদীছটা যে সমস্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে পৌঁছেছে, তাদের সমষ্টিকে ‘সানাদ’ বলে এবং তাঁদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে রিজালুল হাদীছ বা হাদীছের রাবী বলা হয়। আর যে হাদীছটি পৌঁছেছে সেটিই ‘মাতন’। এককথায় ‘সানাদ’ যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকে ‘মাতন’ শুরু হয়।

◈ সানাদের প্রকারভেদ (أقسام السند) :

সানাদ মূলত দুই প্রকার। যথা- (১) আলী বা উঁচু সনদ এবং (২) নাযিল বা নীচু সনদ। নিম্নে আলোচনা করা হল :

আলী বা উঁচু সনদের পরিচয় :

যে সানাদে রাসূল (ছাঃ) ও রাবীর মাঝের স্তর কম সে সানাদকে আলী বা উঁচু সানাদ বলা হয়।

নাযিল বা নীচু সনদের পরিচয় :

যে সানাদে রাসূল (ছাঃ) ও রাবীর মাঝের স্তর বেশী সে সানাদকে নাযিল বা নীচু সানাদ বলা হয়।

উপকারিতা :

আলী বা উঁচু সানাদ মুহাদ্দিছগণের খুব প্রিয়। তারা মাসের পর মাস সফর করেছেন আলী সানাদের জন্য। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে স্তর যত কম হয় হাদীছে ভুলের সম্ভাবনা তত কম হয়। কুতুবে সিত্তাহ্‌র সংকলকগণের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রায় ১৬টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যাতে রাসূল (ছঃ) ও ইমাম বুখারীর মাঝে স্তর বা রাবী মাত্র তিনজন।

উদাহরণস্বরূপ- ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

‘আমাকে মাক্কী বিন ইবরাহীম হাদীছ শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, তাকে ইয়াযীদ বিন আবী উবাইদ হাদীছ শুনিয়েছেন, তিনি সালামা আল-আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার নামে কোন কথা বলল অথচ আমি সেটা বলিনি, তাহলে তার বাসস্থান জাহান্নাম’।[৭]

অত্র হাদীছে ইমাম বুখারী ও রাসূল (ছাঃ)-এর মাঝে মাত্র তিনজন রাবী রয়েছে। এজন্য ইমাম বুখারীর অন্য সানাদগুলোর চেয়ে এই সানাদ আলী বা উঁচু সানাদ।

◈ হাদীছ ও তার প্রকারভেদ (أقسام الحديث) :

‘হাদীছ’-এর সংজ্ঞা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীছ বলা হয়।

উক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী হাদীছ তিন প্রকার। যথা- (১) হাদীছে ক্বওলী বা রাসূল (ছাঃ)-এর কথা (২) হাদীছে ফে‘লী বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাজ এবং (৩) হাদীছে তাক্বরীরী বা রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মতি। নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) হাদীছে ক্বওলী বা রাসূল (ছাঃ)-এর কথা : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীকে হাদীছে ক্বওলী বলা হয়। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

অর্থাৎ ‘প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল’।[৮]

(২) হাদীছে ফে‘লী বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাজ : মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে কাজ করেছেন, সেই কাজকে হাদীছে ফে‘লী বলা হয়। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُودِ.

৭. ছহীহ বুখারী হা/১০৯ ‘নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করা অন্যায়’ অনুচ্ছেদ-৩৮, ‘ইলম’ অধ্যায়-৩।
৮. ছহীহ বুখারী হা/১।

অর্থাৎ ‘রাসূল (ছাঃ) তাঁর দুই হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন, যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন এবং রুকূর জন্য তাকবীর দিতেন। অতঃপর যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ করতেন এবং বলতেন, ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ্’। আর তিনি সিজদাতে অনুরূপ করতেন না’।[৯]

(৩) হাদীছে তাক্বরীরী বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মতি : ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কোন কাজ করলেন, কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তা দেখার পরেও বা শুনার পরেও কিছুই বললেন না, বরং চুপ থাকলেন। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর এমন কাজের উপর রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মতিকে ‘হাদীছে তাক্বরীরী’ বলা হয়ে থাকে। যেমন- আমর বিন ‘আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

احْتَلَمْتُ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِى الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى مَنَعَنِى مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّى سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

‘একদা যাতুস সালাসিল যুদ্ধে কঠিন ঠাণ্ডা রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার ভয় হয় যদি গোসল করি তাহলে মারা যাব। সেজন্য আমি তায়াম্মুম করি এবং আমার সাথীদের ছালাতের ইমামতি করাই। পরবর্তীতে তারা বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে উল্লেখ করে। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেন, আমর! তুমি জুনুবী অবস্থায় ছালাত পড়িয়েছ! আমি তখন রাসূল (ছাঃ)-কে জানালাম, কি কারণে আমি গোসল করিনি। আমি বললাম, মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর না! নিশ্চয় মহান আল্লাহ তোমাদের উপর দয়ালু’ *(নিসা ৪/২৯)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) হেসে উঠলেন এবং কিছুই বললেন না’।[১০] এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (ছাঃ) তার এই কাজের ব্যাপাওে মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। তথা জীবনের আশংকা থাকলে ফরয গোসলের ক্ষেত্রেও তায়াম্মুম চলবে।

◈ খবার ও আছার (الخبر والأثر) :

কিছু মুহাদ্দিছগণের মতে খবার এবং আছার হল, এটি হাদীছের সমার্থবোধক শব্দ বা প্রতিশব্দ। তবে বর্তমান যুগের প্রায় মুহাদ্দিছ হাদীছ, আছার এবং খবারের মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। যেমন-

‘খবার’-এর পরিচয় :

‘খবার’ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, কিন্তু হাদীছ হচ্ছে খাছ। শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর কথাকে ‘হাদীছ’ বলা হয় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর কথাসহ দুনিয়ার যেকোন সংবাদকে ‘খবার’ বলা হয়।

‘আছার’-এর পরিচয় :

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সম্মতিকে আছার বলা হয়।

◈ কুরআন, হাদীছ এবং হাদীছে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য

---

৯. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫।

১০. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৮৪৫, সনদ ছহীহ।

(الفرق بين القران والحديث والحديث القدسي)

কুরআন, হাদীছ এবং হাদীছে কুদসী সবগুলোই মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অহি। কিন্তু তারপরেও প্রত্যেকটির মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নীচের ছকের মাধ্যমে কতিপয় পার্থক্য তুলে ধরা হল :

কুরআন ও হাদীছে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য

ক্রঃ নং	কুরআন	হাদীছে কুদসী
১	কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।	হাদীছে কুদসীর অর্থ মহান আল্লাহ্‌র, কিন্তু শব্দ রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত।
২	সম্পূর্ণ কুরআন মুতাওয়াতির। রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রতি যুগে হাযার হাযার মানুষ তা রিওয়ায়েত করেছেন।	হাদীছে কুদসী মুতাওয়াতির নয়; বরং হাদীছে কুদসী ছহীহ, যঈফ ও জাল সবই হতে পারে।
৩	কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী হয়।	হাদীছে কুদসী পাঠের নির্ধারিত কোন নেকী নেই।
৪	কুরআন তিলাওয়াত একটি ইবাদত, যা ব্যতীত ছালাত বিশুদ্ধ হয় না।	হাদীছে কুদসী পাঠ করা এই রকম কোন ইবাদত নয়।
৫	আল-কুরআনের কোন আয়াতই ভাবার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়নি; বরং এর ভাবার্থ নকল করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।	সুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রে ভাবার্থ নকল করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।
৬	পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত রয়েছে।	হাদীছে কুদসীর কোন আয়াত ও সূরা নেই।
৭	পবিত্র কুরআনের ভাষা মু‘জিযা। এটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াবাসীর জন্য চ্যালেঞ্জ।	হাদীছে কুদসীর ভাষা মু‘জিযা নয়।

হাদীছ ও হাদীছে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য

ক্রঃ নং	হাদীছে কুদসী	হাদীছ
১	হাদীছে কুদসীকে রাসূল (ছাঃ) মহান আল্লাহ্‌র দিকে নিসবাত করে বর্ণনা করেন।	হাদীছকে মহান আল্লাহ্‌র দিকে নিসবাত করে বলেন না।

২	হাদীছে কুদসী সর্বদা ক্বওলী হয়। হাদীছে কুদসী হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষার আবরণে মহান আল্লাহ্র কথা।	হাদীছ ক্বওলী, ফে‘লী ও তাক্বরীরী হয়। তথা রাসূল (ছাঃ)-এর কথা যেমন হাদীছ, তেমনি তার দৈনন্দিন কাজ ও সম্মতিও হাদীছ।
৩	হাদীছে কুদসী সাধারণত ভয়, আশা, মহান আল্লাহ্র সাথে বান্দার কথা ইত্যাদি বিভিন্ন গায়েবী বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। হুকুম-আহকামের ব্যাপারে হাদীছে কুদসী নেই বললেই চলে।	ইসলামের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান হিসাবে হাদীছের বর্ণনা বেশী।

◈ ছাহাবী ও তাবেঈ (الصحابي والتابعي) :

‘ছাহাবী’ (الصحابي)-এর পরিচয় :

শাব্দিক অর্থ হল সঙ্গী, সাথী। পারিভাষিক অর্থে, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মুমিন অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুমিন অবস্থায় মারা গেছেন তিনি ছাহাবী।

উদাহরণ-১ : আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওছমান (রাঃ), আলী (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ ।

ব্যাখ্যা : যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মুমিন অবস্থায় দেখা করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে এবং মুরতাদ অবস্থায় মারা গেছে তারা ছাহাবী নন। তবে যারা মুরতাদ হওয়ার পর তওবা করতঃ আবার ঈমান এনেছেন তারা ছাহাবী হিসাবে গণ্য হবেন।

উদাহরণ-২ : আব্দুল্লাহ ইবনু আবিস সারহ (রাঃ), তুলায়হা আল-আসাদী (রাঃ)। তারা মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় তওবা করে ঈমান আনয়ন করেছেন। ফলে তাঁরা ছাহাবী।

ছাহাবীদের ব্যাপারে আক্বীদাগত হুকুম : ছাহাবীগণ সবাই ন্যায়পরায়ণ। তাঁরা জেনে-বুঝে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর কোন মিথ্যারোপ করেন না বা করতে পারেন না।

ছাহাবীগণের জীবনী সংক্রান্ত কিতাব :

ছাহাবীগণের জীবনীর উপর লিখিত অনেক বই রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে-

(১) আল-ইছাবা ফী তাময়িযিছ ছাহাবা (اَلْإِصَابَةَ فِيْ تَمِيْزِ الصَّحَابَةِ)- হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী ।

(২) আল-ইস্তি‘আব ফী মা‘রিফাতিছ ছাহাবা (اَلْإِسْتِيْعَابُ فِيْ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ)- হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র।

‘তাবেঈ’ (التابعي)-এর পরিচয় :

যিনি মুমিন অবস্থায় কোন ছাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুমিন অবস্থায় মারা গেছেন তিনিই তাবেঈ।

উদাহরণ : নাফে‘, ইবনু সীরীন, মুজাহিদ, ত্বঊছূ প্রমুখ।

‘মুখাযরাম’-এর পরিচয় (المخضرم):

যিনি একাধারে জাহিলী যুগ ও ইসলামী যুগ পেয়েছেন, কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। তাদেরকে ‘মুখাযরাম’ বলা হয়

উদাহরণ : বাদশাহ নাজাশী, আবু ওছমান আন-নাহদী, আবু আমর আশ-শায়বানী প্রমুখ।

হুকুম : মুখাযরামগণ উঁচু পর্যায়ের তাবেঈ হিসাবে গণ্য হবেন। ছাহাবী হিসাবে গণ্য হবেন না। যদিও তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ঈমান আনয়ন করে থাকেন।

মুখাযরামগণের সংখ্যা : ইমাম মুসলিমের হিসাব অনুযায়ী মুখাযরাম রাবীগণের সংখ্যা বিশের অধিক। ইমাম মুগলত্বঈ-এর হিসাব অনুযায়ী মুখাযরাম রাবীগণের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন।

নোট : আমর ইবনু 'আছ (রাঃ) ছাহাবীগণের একজন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তিনি যার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তিনি ছাহাবী ছিলেন না; বরং তাবেঈ বা মুখাযরাম ছিলেন। আর তিনি হচ্ছেন বাদশাহ নাজাশী। বাদশাহ নাজাশীর মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার 'ইছাবা' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১১]

মুখাযরামগণের জীবনী সংক্রান্ত কিতাব : বুরহান হালাবী প্রণীত 'তাযকিরাতু-ত্বলিব আল-মু'আল্লিম বিমান ইউক্বালু ইন্নাহু মুখাযরাম' (تذكرة الطالب المعلم بمن يقال انه مخضرم) -এটি মুখাযরামগণের জীবনী বিষয়ের একটি অন্যতম কিতাব।

মুসনাদ (المسند) :

উছূলে হাদীছের দৃষ্টিতে মুসনাদের সংজ্ঞা তিনটি। যথা-

(ক) মুসনিদ : নুন বর্ণে জের দিয়ে। প্রত্যেক হাদীছ বর্ণনাকারীকে মুসনিদ বলা হয়।

(খ) মুসনাদ : ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর নামের উপর ভিত্তি করে যে গ্রন্থ সাজানো হয়, তাকে মুসনাদ বলা হয়।

(গ) মুসনাদ : হাদীছের সানাদকে মুসনাদ বলা হয়। এমতবস্থায় মুসনাদের মীমকে মাসদারের মীম ধরা হবে।

মুহাদ্দিছ (المحدث)-এর পরিচয় :

যিনি হাদীছের সানাদ ও মাতন নিয়ে গবেষণা করেন। অধিকাংশ রিওয়ায়াত ও রাবী সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকে, তাকে 'মুহাদ্দিছ' বলা হয়।

হাফেয (الحافظ)-এর পরিচয় :

হাফেয প্রায় মুহাদ্দিছের মতই। তবে হাদীছ শাস্ত্রে হাফেযের জ্ঞান এতই বেশী যে, তার জ্ঞানের বাইরে থাকা রাবী ও হাদীছের সংখ্যা অতি অল্প সংখ্যক হয়।

ফুক্বাহায়ে সাব'আ বা সাতজন শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ :

ইসলামী বই-পুস্তকে ফুক্বাহায়ে সাব'আ পরিভাষাটি অনেক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফুক্বাহায়ে সাব'আ দ্বারা উদ্দেশ্য সাতজন শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ তাবেঈ। যেমন-

১. সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহঃ)।
২. আবুবকর (রাঃ)-এর পৌত্র কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ)।
৩. যুবায়র ইবনু আওয়াম (রাঃ)-এর ছেলে উরওয়া (রহঃ)।
৪. অহি লেখক যায়দ ইবনু ছাবিত (রাঃ)-এর ছেলে খারিজা (রহঃ)।
৫. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ছেলে সালিম (রহঃ)।
৬. ওবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনু মাসঊদ (রহঃ)।

---

১১. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফী তাময়িযিছ-ছাহাবা (বৈরূত : দারুল জীল, ১৪১২ হিঃ) ১/২০৫ পৃঃ।

৭. সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রহঃ)।

উক্ত সাতজন ছাড়াও আরো দুইজন প্রসিদ্ধ ফক্বীহ তাবেঈ রয়েছেন। যথা (১) আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর ছেলে আবু সালামা (রহঃ) (২) আবুবকর ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ)।

শ্রেষ্ঠ তাবেঈ : তাক্বওয়া ও পরহেযগারিতার দিক দিয়ে ওয়াইস আল-ক্বরনী (রহঃ) এবং জ্ঞান ও ইলমের দিক দিয়ে সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহঃ)।

তৃতীয় অধ্যায় : হাদীছের প্রকারভেদ
الباب الثالث : أقسام الحديث
প্রথম পরিচ্ছেদ
(الفصل الأول)
হাদীছের রাবীর সংখ্যার দিক বিবেচনায় হাদীছের প্রকারভেদ
(تقسيم الخبر باعتبار عدد الرواة)

আমাদের নিকটে হাদীছ কতজনের মাধ্যমে পৌঁছল, এর উপর ভিত্তি করে মুহাদ্দিছগণ হাদীছকে দুইভাগে ভাগ করে থাকেন। যথা :

(১) খবারে মুতাওয়াতির।

(২) খবারে আহাদ।

নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হল :

◈ খবারে মুতাওয়াতির (الخبر المتواتر):

'খবারে মুতাওয়াতির'-এর পরিচয় :

যদি কোন হাদীছ আমাদের নিকটে অগণিত রাবীর মাধ্যমে পৌঁছে, তাহলে তাকে 'মুতাওয়াতির' হাদীছ বলা হয়।

আরবীতে প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলোর অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'যে হাদীছের বর্ণনাকারী প্রতি যুগে এত বেশী যে, মানুষের স্বভাবজাত সত্তা এত লোকের একসাথে মিথ্যা বলাকে অসম্ভব মনে করে, সেই হাদীছকে 'খবারে মুতাওয়াতির' বলে'।

হাদীছ মুতাওয়াতির হওয়ার শর্তাবলী :

মুহাদ্দিছগণ হাদীছ মুতাওয়াতির হওয়ার কিছু শর্ত নির্ধারণ করে থাকেন। যেমন-
(ক) রিওয়ায়াতটি বিপুল সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়া।
(খ) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সানাদের সকল স্তরে এই সংখ্যাধিক্যতা বিদ্যমান থাকা।
(গ) রাবীগণের মিথ্যা বর্ণনার বিষয়ে একমত হওয়া স্বভাবত অসম্ভব মনে হওয়া।
(ঘ) রিওয়ায়াতটি ইন্দ্রিয় নির্ভর হওয়া। যেমন- 'আমরা শুনেছি', 'আমরা দেখেছি' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বর্ণিত হওয়া। অর্থাৎ ছাহাবী হাদীছ বর্ণনার সময় 'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন' এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করবেন না। যে হাদীছে এই রকম শব্দ রয়েছে, সে হাদীছ মুতাওয়াতির হিসাবে গণ্য হবে না। বরং ছাহাবী বলবেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি' বা 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে করতে দেখেছি', তখন মুতাওয়াতির বলে গণ্য হবে।

মুতাওয়াতির হাদীছের প্রকারভেদ :

মুতাওয়াতির হাদীছ দুই প্রকার। যথা : (১) শব্দগত (২) অর্থগত।

(১) শব্দগত মুতাওয়াতির (متواتر لفظي): যে হাদীছের শব্দ ও ভাব একইরূপে সকল যুগে বহু সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'মুতাওয়াতিরে লাফযী' বা শব্দগত মুতাওয়াতির বলা হয়।

উদাহরণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে তার থাকার জায়গা জাহান্নাম'।[১২]

স্নেহের শিক্ষার্থীরা! এই হাদীছটি সত্তরের অধিক ছাহাবী হুবহু এই একই শব্দে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটি মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ একমত পোষণ করেছেন।

(২) অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির (متواتر معنوي) : যে হাদীছের মূলভাবটা অনেক হাদীছে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে, সেই হাদীছকে 'মুতাওয়াতিরে মা'নাবী' বা অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির বলা হয় ।

উদাহরণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু'জিযা। 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু'জিযা ছিল' এই মর্মে সরাসরি কোন হাদীছ মুতাওয়াতির ভাবে বর্ণিত হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (ছাঃ) থেকে যত মু'জিযার প্রমাণ পাওয়া যায়, তার সমষ্টি মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জিযা ছিল এটা মুতাওয়তিরে মা'নাবী।

মুতাওয়াতিরের নির্ধারিত সংখ্যা :

অনেকেই মুতাওয়াতির হাদীছের মানদণ্ড হিসাবে কিছু সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। কেউ যেনার সাক্ষীকে সামনে রেখে প্রতি স্তরে ৪ জন রাবীর কথা বলেছেন। কেউ মূসা (আঃ)-এর সত্তর জনকে সাথে নিয়ে তূর পাহাড়ে যাওয়ার ঘটনাকে সামনে রেখে সত্তরকে মানদণ্ডরূপে নির্ধারণ করেছেন। মুতাওয়াতির হাদীছ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই জাতীয় মানদণ্ডের কোন গুরুত্ব নেই। বরং মুহাদ্দিছগণ তাদের বিশেষ যোগ্যতা বলে রাবীর সংখ্যাধিক্য দেখে মুতাওয়াতির হাদীছ নির্ণয় করবেন।

মুতাওয়াতির হাদীছের হুকুম :

মুতাওয়াতির হাদীছের মাধ্যমে যে ইলম হাছিল হয়, তা ইলমে যরূরী বা ইলমে ইয়াক্বীনী। যা সকল স্তরের মানুষ অর্জন করতে পারে।

নোট : 'ইলমে যরূরী' একটি মানতিক্বী[১৩] পরিভাষা। মানুষ যে বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা ও গবেষণা ছাড়াই জানতে পারে, তাকে ইলমে যরূরী বলা হয়। যেমন- মানুষ কোনরূপ চিন্তা ও গবেষণা ছাড়াই আগুন ও পানিকে চিনতে পারে। সুতরাং আগুন ও পানির জ্ঞান যরূরী ও বাদীহী জ্ঞান। অনুরূপ মুতাওয়াতির হাদীছের সানাদের বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা ও গবেষণা করার প্রয়োজন হয় না। কোন হাদীছ মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছা মাত্রই সেটা যে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা তা কোনরূপ দ্বিধা ছাড়াই জানা যায়।

মুতাওয়াতির হাদীছের সংকলন :

সালাফে ছালেহীন মুতাওয়াতির হাদীছ সংকলন করে কয়েকটি বই লিখেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, অল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী প্রণীত- 'আল-আযহার আল-মুতানা-ছিরাহ ফিল আহাদীছিল মুতাওয়াতিরাহ' (الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة)।

◈ খবারে আহাদ (خبر الأحاد):

---

১২. ছহীহ বুখারী হা/ ১২৯১।

১৩. সাধারণ অর্থে যুক্তিবিদ্যাকে 'ইলমুল মানতিক' বলা যেতে পারে। ইলমুল মানতিকের চর্চা এখন উঠে গেলেও অতীতের ওলামায়ে কেরামের বইগুলোতে ইলমুল মানতিকের পরিভাষা সমূহের ব্যাপক ব্যবহার পাওয়া যায়। তাই অতীতের বইগুলোর লেখার পাঠোদ্ধার করতে গেলে মানতিকের পরিভাষা জানার প্রয়োজন রয়েছে।

উছূলে হাদীছে বা মুছত্বলাহুল হাদীছের প্রায় সকল আলোচনা ও হুকুম-আহকাম খবারে আহাদের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।

‘খবারে আহাদ’-এর পরিচয় :

যে হাদীছকে এক বা একাধিক রাবী বর্ণনা করে, কিন্তু তা মুতাওয়াতিরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না, সেই হাদীছকে ‘খবারে আহাদ’ বলা হয়।

‘খবারে আহাদ’-এর হুকুম : খবারে আহাদ যদি ছহীহ হয়, তাহলে তা ইলম বা জ্ঞানের ফায়দা দিবে।

হুকুম-এর ব্যাখ্যা :

(ক) যে খবারে আহাদ বুখারী-মুসলিমের হাদীছ এবং তার ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিছের দ্বিমত নেই।
(খ) যে খবারে আহাদের রাবীগণ ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক (রহঃ) প্রমুখের মত হাফেযে হাদীছ।
(গ) যে খবারে আহাদ মুস্তাফীয বা মাশহূর এবং তার ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিছের কোন দ্বিমত নেই।

উপরের তিন প্রকারের খবারে আহাদের হাদীছ দ্বারা অর্জিত জ্ঞান মুতাওয়াতির হাদীছের মত ইলমে ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়। তবে মূল মুতাওয়াতির হাদীছের সাথে দ্বন্দ্ব হলে মূল মুতাওয়াতির হাদীছই প্রাধান্য পাবে। যেমন-

(১) যে খবারে আহাদ উপরের তিন প্রকারের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে এর সানাদ ছহীহ বা হাসান।
(২) যে খবারে আহাদের ছহীহ ও যঈফ হওয়া নিয়ে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু সঠিক মন্তব্য অনুযায়ী সানাদ ছহীহ।

এই দুই প্রকার খবারে আহাদ শুধু জ্ঞানের ফায়দা দিবে। অর্থাৎ মুতাওয়াতির দিবে নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা আর এই দুই প্রকার দিবে শুধু জ্ঞানের ফায়দা। এককথায় মুতাওয়াতিরের চেয়ে নিম্নস্তরের জ্ঞানের ফায়দা দিবে।

উল্লেখ্য, খবারে আহাদ নিশ্চিতভাবে যঈফ অথবা যঈফ হওয়া নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। কিন্তু যদি সঠিক মন্তব্য অনুযায়ী যঈফ হয়, তাহলে তা যন্ বা ধারণার ফায়দা দিবে।

নোট : মুতাকাল্লিমীন বা যুক্তিবিদগণের নিকটে খবারে আহাদ ধারণার ফায়দা দেয়। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক উছূলবিদগণও একই কথা বলেছেন। তাদের মতে, মুহাদ্দিছগণের নিকটে সকল খবারে আহাদ নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়। এই কারণে তারা মুহাদ্দিছগণকে ফক্বীহ মনে করেন না। কিন্তু বাস্তবতা হল, মুহাদ্দিছগণই হাদীছের উপর সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। হাদীছ সম্পর্কে তাঁদের বিশ্লেষণ হয় সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও নির্ভরযোগ্য। যুক্তিবিদগণ মুহাদ্দিছগণ সম্পর্কে যে মন্তব্য করে থাকেন, তা অপবাদ বৈ কিছুই নয়। মুহাদ্দিছগণ ‘আম’ বা ব্যাপকভাবে সকল খবারে আহাদকে নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা প্রদানকারী বলেননি। তাদের নিকটে খবারে আহাদ হাদীছের হুকুম তার সানাদের উপর নির্ভর করে। ছহীহ খাবারে আহাদ এক রকম ফায়দা দিবে। মুত্তাফাক্ব আলাইহ খবারে আহাদ আরেক রকম ফায়দা দিবে। যঈফ খবারে আহাদ অন্য রকম ফায়দা দিবে। সুতরাং খবারে আহাদ সরাসরি ধারণার ফায়দা দেয়- এই কথা বলার মাধ্যমে যুক্তিবিদগণ নিজেদের নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, অনেক উছূলবিদও খবারে আহাদ ظن- বা ধারণার ফায়দা দেয় বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তাদের এই ظن- বা ধারণা দ্বারা ‘ধারণা’ উদ্দেশ্য নয়। বরং জ্ঞানই উদ্দেশ্য। কেননা তারা এ বিষয়ে একমত যে, খবারে আহাদের প্রতি আমল করা ওয়াজিব। তাহলে একটা ধারণা প্রসূত বিষয়ের উপর আমল করা কিভাবে ওয়াজিব হতে পারে। অন্যদিকে আরবী ভাষায় ‘ظن যন’ শব্দটি নিশ্চিত জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে। স্বয়ং মহান আল্লাহ ‘ ظنযন’ শব্দটিকে নিশ্চিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

অর্থাৎ 'যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, তারা একদিন তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তারা তারই নিকটে ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৪৬)*।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ নিশ্চিত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ' ظن যন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং বর্তমান হাদীছ অস্বীকারকারীগণ ' ظن যন' শব্দের অপব্যবহার করার মাধ্যমে হাদীছ অস্বীকার করার যে চোরাগলি খুঁজেন, তার কারণ মূলত আরবী ভাষার ক্ষেত্রে অদক্ষতা।

হাদীছের উপর মুহাদ্দিছগণ যে হুকুম আরোপ করেন তা নিশ্চিত হওয়ার পরই করেন। সুতরাং কিভাবে এটা সম্ভব যে, একটা বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা নিশ্চিত হওয়ার পর মুহাদ্দিছগণ 'ছহীহ' হুকুম লাগাচ্ছেন আর আমি বলছি যে, এটা ধারণার ফায়দা দেয়। রাসূল (ছাঃ)-এর কথা নিশ্চিত হওয়ার পরেও কি করে তা ধারণার ফায়দা দিতে পারে!

তাইতো হানাফী মাযহাবের অনেক বড় আলেম আল্লামা সারাখসী, আবুবকর আল-জাছ্ছাছ এবং ঈসা ইবনু আবান (রহঃ) বলেছেন, খবারে আহাদ জ্ঞানের ফায়দা দেয়। কিন্তু তারা নিশ্চিত জ্ঞান ও অন্তরে প্রশান্তিদায়ক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের মতে মুতাওয়াতির নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়। আর খবারে আহাদ 'ইলমে তুমানীনাহ' বা 'প্রশান্তিদায়ক জ্ঞান'-এর ফায়দা দেয়।[১৪]

আর এটা কেনইবা হবে না, যেখানে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ হুকুম-আহকাম তো খবারে আহাদের উপরই ভিত্তিশীল। যেমন- দাদীর জন্য মৃতের সম্পত্তিতে এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করা। শুধু হুকুম-আহকাম নয়, আক্বীদাগত বিষয়ও খবারে আহাদ দ্বারা সকল মাযহাবের আলেমগণ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন- কবরের আযাব, মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন, পরকালে মহান আল্লাহ্র দর্শন। এমনও খবারে আহাদ রয়েছে, যার দ্বারা সকল মাযহাবের আলেমগণ কুরআনের আয়াতকে মানসূখ করেছেন। যেমন- কুরআনে মহান আল্লাহ উত্তরাধিকারীদের জন্য অছিয়ত করার কথা বলেছেন *(বাক্বারাহ ২/১৮০)*। অন্যদিকে উত্তরাধিকারীদের জন্য নির্ধারিত অংশ কুরআনে অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

'নিশ্চয় মহান আল্লাহ সকল হক্বদারের হক্ব নির্ধারণ করেছেন। অতএব সাবধান! উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন অছিয়ত নেই'।[১৫] রাসূল (ছাঃ)-এর এই খবারে আহাদ হাদীছ দিয়ে সকল মাযহাবের আলেমগণ অছিয়তের আয়াতকে মানসূখ বলেছেন। সুতরাং একথা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট যে, খবারে আহাদ ধারণা প্রসূত হতেই পারে না।

একটি সংশয় ও তার জবাব :

অভিযোগকারীদের প্রশ্ন হল, রাবী যতই মযবূত হোক সে কি ভুল করতে পারে না? একজন সত্যবাদী কি সবসময় সত্য বলে? সে কি মিথ্যা বলতে পারে না? সুতরাং শুধু রাবীদের সত্য-মিথ্যা যাচাই করে কিভাবে হাদীছের সত্য-মিথ্যা যাচাই করা যায়?

জবাব : সত্যি বলতে কি, এই অভিযোগ যারা উত্থাপন করেন, তাদের মূলত ইলমে হাদীছের সাথে গভীর সম্পর্ক নেই। যাদের ইলমে হাদীছের সাথে সম্পর্ক আছে, তারা এই অভিযোগ আনতেই পারেন না। কেননা শত শত হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ যঈফ বলেছেন। অথচ সেই হাদীছগুলো বাহ্যিকভাবে ছহীহ, যার রাবী শক্তিশালী ও ন্যায়পরায়ণ এবং সানাদ বিচ্ছিন্নও নয়। তারপরেও মুহাদ্দিছগণ যঈফ বলেছেন। কেন? সেই হাদীছের মধ্যে গোপনক্রটি রয়েছে তাই। একজন স্বর্ণকার যেমন নিজের অভিজ্ঞতার বদৌলতে স্বর্ণ দেখলেই বলতে পারে নকল না আসল, তেমনি বিজ্ঞ মুহাদ্দিছগণ হাদীছ দেখলেই ধরতে পারেন হাদীছের কোথায় ক্রটি। আয়নার সামনে যেমন মুখ ধরলে মুখের একটা ছোট্ট দাগও বুঝা যায়, তেমনি ইমাম আহমাদ ও বুখারী (রহঃ) প্রমুখদের সামনে হাদীছ ধরলে তারা হাদীছের

---

১৪. উছূলুস সারাখসী (বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিইয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রীঃ) ১/২৯২ পৃঃ; উছূলুল বাযযাবী ১/১৫৮ পৃঃ।

১৫. ইবনু মাজাহ হা/২৭১৪; শায়খ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৬৩৫, সনদ ছহীহ।

ছোট্ট ত্রুটিও টের পেয়ে যান। এই গোপন ত্রুটিকে বলে 'ইল্লাত'। কোন হাদীছে ইল্লাত থাকলে মুহাদ্দিছগণ সেই হাদীছকে ছহীহ বলা থেকে বিরত থাকেন। সুতরাং রাবী মযবূত হওয়ার পরেও যদি রাবীর পক্ষ থেকে কোন ত্রুটির আশংকা থাকে, তাহলে মুহাদ্দিছগণ অবশ্যই তা ধরতে পারবেন। অতএব মুহাদ্দিছগণ সর্বসম্মতিক্রমে যে হাদীছকে ছহীহ বলে থাকেন, সে হাদীছ রাসূল (ছাঃ)-এর কথা হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যদি থাকে, তাহলে তো হাদীছ শাস্ত্র রক্ষার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। তাইতো সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা (রহঃ) বলেন,

مَا سَتَرَ اللهُ أَحَداً يَكْذُبُ فِيْ الْحَدِيْثِ.

অর্থাৎ 'হাদীছে মিথ্যারোপ করে এমন কারো গোপনীয়তা মহান আল্লাহ রক্ষা করেন না। অর্থাৎ মুহাদ্দিছগণের নিকট তা ধরা পড়েই'।[১৬]

আল্লাহু আকবার! মহান আল্লাহ গোপন রাখবেনইবা কেমন করে? তিনিই তো সেই সত্তা, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংরক্ষণের ওয়াদা করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ তাঁর এই ওয়াদা মুহাদ্দিছগণের দ্বারা পূরণ করেছেন। তাইতো তারাই এবং যুগের পর যুগ যারা তাদের অনুসরণ করে তারাই এই উম্মাতের মুক্তিপ্রাপ্ত জামা'আত, যাদের সর্ম্পকে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ.

'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি জামা'আত হক্বের উপর টিকে থাকবে। কোন ষড়যন্ত্রকারী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[১৭] আহ! সেদিন কতই না গর্বের দিন হবে!! যেদিন মুহাদ্দিছগণ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকবেন। যারা রাসূলকে না দেখেও নিজেদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও তাঁর হাদীছকে সংরক্ষণ করেছেন, ক্ষুধার্ত থেকে, জেলে গিয়ে, চাবুকের আঘাত সহ্য করে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীর প্রচার ও প্রসার বন্ধ করেনি, তারা যেদিন সেই না দেখা মহামানবের সাথে দেখা করবেন, সেই দিনটা কতই না আনন্দের দিন হবে! হে আল্লাহ! সেইদিন আমরা যারা মুহাদ্দিছগণকে ভালবাসি, তাদেরকে এবং মুহাদ্দিছগণকে তাঁদের একমাত্র ইমাম মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খবারে আহাদের প্রকারভেদ (أقسام خبر الأحاد):

খবারে আহাদ তিন প্রকার। যথা : (১) মাশহূর (২) গরীব এবং (৩) আযীয। নিম্নে প্রকারগুলো সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হল :

'মাশহূর' (المشهور)-এর পরিচয় :

শাব্দিক অর্থে, যে হাদীছ মানুষের মাঝে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ, যদিও হাদীছটি জাল হয় তা মাশহূর বা প্রসিদ্ধ হাদীছ। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীছের সানাদের প্রতি স্তরে তিন বা ততোধিক রাবী থাকে, তাকে 'মাশহূর' হাদীছ বলে।

উদাহরণ : 'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ'। অত্র হাদীছটি খুবই প্রসিদ্ধ। অথচ হাদীছটি জাল ও ভিত্তিহীন।[১৮]

মাশহূর হাদীছের গ্রন্থাবলী :

---

১৬. মুহাম্মাদ খালাফ সালামা, লিসানুল মুহাদ্দিছীন ৩/১৪২ পৃঃ; জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনু আবুবকর আস-সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হিঃ), তাহযীরুল খাওয়াছ মিন আকা-যীবিল ক্বাছাছ (বৈরূত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৩৯৪-১৯৭৪), পৃঃ ১৩১।
১৭. ছহীহ মুসলিম হা/৫০১৯।
১৮. حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ-ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিয যঈফাহ (রিয়ায : দারিল মা'আরিফ, ১৯৯২ ইং) হা/৩৬।

পারিভাষিক অর্থে যে হাদীছগুলো মাশহূর, সেগুলোকে আলাদাভাবে কোন মুহাদ্দিছ জমা করেছেন কি-না তা জানা যায় না, তবে মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হাদীছকে অনেক মুহাদ্দিছ জমা করেছেন। যেমন :

(ক) আল-মাক্বাছিদুল হাসানা ফীমাশতাহারা আলাল-আলসিনাহ (اَلْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ فِيْمَا اشْتَهَرَ عَلَي الْأَلْسِنَةِ)-গ্রন্থটির লেখক আল্লামা সাখাবী (রহঃ)। (খ) কাশফুল খাফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস ফীমাশতাহারা মিনাল আহাদীছ আলা আলসিনাতিন-নাস(كَشْف الْخَفَا وَمُزِيْلُ الْإِلْبَاسِ فِيْمَا اشْتَهَرَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ عَلَي أَلْسِنَةِ النَّاسِ) - আল্লামা আজলূনী (রহঃ) উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

'আযীয' (العزيز)-এর পরিচয় :

শাব্দিক অর্থ শক্ত হওয়া, দুর্লভ হওয়া। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীছের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন যুগে দুইজনের কম ছিল না, তাকে 'আযীয' হাদীছ বলা হয়। দুইজন রাবী থেকে আসার কারণে হাদীছটি শক্তি লাভ করে, তাই তাকে আযীয বলা হয়। দুর্লভ হওয়ার কারণেও তাকে আযীয বলা হয়।

নোট :

(ক) মু'তাযিলা মতবাদের অন্যতম গুরু আবু আলী আল-জুব্বায়ীর মতে, হাদীছ ছহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া শর্ত। তথা প্রতি স্তরে নিম্ন পক্ষে দুইজন রাবী থাকা যরূরী। এই মূলনীতির মাধ্যমেই খবারে আহাদকে অস্বীকার করার যাত্রা শুরু হয়। এটি একটি ভ্রান্ত মূলনীতি। হাদীছ ছহীহ হওয়ার জন্য সংখ্যা কোন মানদণ্ড নয়; রাবীদের ন্যায়পরায়ণতাই হল মূল মানদণ্ড।

(খ) ইবনু হিব্বান (রহঃ) মু'তাযিলাদের প্রতিবাদে মন্তব্য করেন, 'হাদীছের ভাণ্ডারে আযীয হাদীছের কোন অস্তিত্বই নেই'। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) তার এই কথাকে খণ্ডন করে আযীয হাদীছের উদাহরণ পেশ করেছেন।

উদাহরণ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

অর্থাৎ 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা ও সন্তানের চেয়ে ভালবাসার পাত্র হই'।[১৯]

আযীয হাদীছের গ্রন্থাবলী :

আযীয হাদীছকে জমা করে আলাদাভাবে কোন কিতাব মুহাদ্দিছগণের পক্ষ থেকে পাওয়া যায় না। এটা মূলত আযীয হাদীছের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে।

'গরীব' (الغريب)-এর পরিচয় :

শাব্দিক অর্থ অপরিচিত। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীছের সানাদে কোন এক স্তরের রাবী মাত্র একজন সেই হাদীছকে গরীব বলা হয়।

'গরীব' হাদীছের ব্যাখ্যা :

গরীব হওয়ার জন্য হাদীছের সকল স্তরে একজন রাবী হওয়া শর্ত নয়। বরং সকল স্তরে যদি বহু সংখ্যক রাবী হয় কিন্তু কোন এক স্তরে একজন রাবী হয়, তাহলেই তা গরীব বলে গণ্য হবে। আযীয হাদীছের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। কোন এক স্তরে দুইজন রাবী থাকলেই তা আযীয বলে গণ্য হবে, যদিও অন্য স্তরে শত রাবী থাকে।

---

১৯. ছহীহ বুখারী হা/১৪।

কাল্পনিক উদাহরণ : মনে কর! আমাকে আব্দুর রহমান এবং ফরীদ নামের দুইজন এসে বলল, 'আপনি কি জানেন আজ না কাশিমপুর গ্রামের মাহমূদ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে'? আমি বললাম, 'তোমরা কিভাবে জানলে'? তারা বলল, 'আমাদেরকে আল-আমীন বলেছে। তাকে না-কি মাহমূদের দুই বন্ধু যুবায়ের ও আকরাম বলেছে' ।

এই ঘটনাটার সকল স্তরে দুইজন করে রাবী রয়েছে। শুরুর স্তরে আব্দুর রহমান ও ফরীদ। শেষ স্তরে যুবায়ের ও আকরাম। কিন্তু মাঝখানে শুধু আল-আমীন। এখন এই ঘটনার উপর আমরা কি হুকুম লাগাব? অবশ্যই গরীব। কেননা সকল স্তর আমাদের লক্ষ্য নয়। কোন এক স্তরে একজন রাবী হলেই তা গরীব বলে বিবেচিত হবে। তেমনি এই উদাহরণের সকল স্তরে যদি রাবীর সংখ্যা দুই-এর বেশী হয় কিন্তু কোন এক স্তরে গিয়ে শুধু দুই জন রাবী হয়, তাহলে তা আযীয বলে বিবেচিত হবে।

বাস্তব উদাহরণ : ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

অর্থাৎ 'নিশ্চয় প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[২০] অত্র হাদীছটি ওমর (রাঃ) থেকে শুধুমাত্র আলকামা বিন ওয়াক্কাস আল-লায়ছী বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীছটি গরীব।

যেসব গ্রন্থে গরীব হাদীছ বেশী পাওয়া যায় :

(১) মুসনাদে বাযযার (مسند البزار)- ইমাম আহমাদ ইবনু আমর আল-বাযযার।
(২) আল-মু'জামুল আওসাত্ব (المعجم الأوسط)-ইমাম সুলায়মান ইবনু আহমাদ আত-ত্বাবারাণী।
(৩) গরায়েবে মালিক (غرائب مالك) -ইমাম দারাকুতনী।

নোট : কোন হাদীছ মাশহূর বা আযীয হলেই যে সে হাদীছ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তা নয়। বরং
য়ার উপর। তবে হ্যাঁ, মাশহূর
্য পাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(الفصل الثاني)

গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ার দিক দিয়ে হাদীছের প্রকারভেদ

(أقسام الحديث باعتبار القبول والرد)

গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ার দিক দিয়ে হাদীছ দুই প্রকার। (ক) মাক্ববূল তথা গ্রহণীয়। (খ) মারদূদ তথা পরিত্যাজ্য।

নোট : গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ার আলোচনা শুধুমাত্র খবারে আহাদের সাথে সম্পর্কিত। মুতাওয়াতির হাদীছ এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ক. মাক্ববূল (المقبول):

২০. ছহীহ বুখারী হা/১।

মাক্বূল বা গ্রহণযোগ্য হাদীছ মোট চার প্রকার। যথা : (১) ছহীহ লি-যাতিহী (২) হাসান লি-যাতিহী (৩) ছহীহ লি-গইরিহী এবং (৪) হাসান লি-গইরিহী। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় আলোচনা করা হল :

প্রথম প্রকার- ছহীহ লি-যাতিহী (صحيح لذاته)-এর পরিচয় :

সংজ্ঞা : যে হাদীছের মধ্যে হাদীছ ছহীহ হওয়ার ৫টি শর্ত পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তাকে 'ছহীহ লি-যাতিহী' বলে।

হাদীছ ছহীহ হওয়ার শর্ত ৫টি। যথা :

(এক) রাবী ন্যায়পরায়ণ হওয়া।

(দুই) হাদীছ সংরক্ষণে রাবী মযবূত হওয়া।

(তিন) সানাদ মুত্তাছিল হওয়া অর্থাৎ সানাদে বিচ্ছিন্নতা না থাকা।

(চার) হাদীছ শায না হওয়া।

(পাঁচ) হাদীছে কোন গোপন ইল্লাত না থাকা।

যখন এই ৫টি শর্ত কোন হাদীছের মাঝে পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তখন সেই হাদীছকে ছহীহ লি-যাতিহী বলা হয়। নীচে শর্তগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হল :

শর্ত-১ : রাবী ন্যায়পরায়ণ হওয়া

পাপী নয়, মিথ্যুক নয়, অপরিচিত নয় বরং পরিচিত, তাক্বওয়াশীল, পরহেযগার ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিকে আদিল বা ন্যায়পরায়ণ বলা হয়। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলতে ভারত্বকে বুঝায়। চায়ের স্টলে, দোকান-পাটে আড্ডা না দেয়া, ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়াতে লিপ্ত না হওয়া ইত্যাদি।

শর্ত-২ : হাদীছ সংরক্ষণে রাবী মযবূত হওয়া

হাদীছ দুইভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। (ক) মুখস্থ শক্তির মাধ্যমে ও (খ) লিখে রাখার মাধ্যমে। মুখস্থ শক্তিতে মযবূত অর্থ হচ্ছে, স্মৃতি শক্তি ভাল, অত্যধিক ভুল করে না, মযবূত রাবীদের সাথে বৈপরীত্য সম্পন্ন হাদীছ বর্ণনা করে না, হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনার সময় অমনোযোগী থাকে না। লিখিত সংরক্ষণে মযবূত অর্থ হচ্ছে, লিখে নেওয়ার পর থেকে অন্যের নিকট বর্ণনা করা পর্যন্ত কিতাবটি নিজের কাছেই থাকা, অন্য কারো কাছে হস্তান্তরিত না হওয়া, পুড়ে বা হারিয়ে না যাওয়া।

শর্ত-৩ : সানাদ মুত্তাছিল হওয়া অর্থাৎ সানাদে বিচ্ছিন্নতা না থাকা

হাদীছের সানাদে প্রত্যেক রাবীর তার উস্তাদের নিকট থেকে সরাসরি হাদীছ শ্রবণ করা।

শর্ত-৪ : হাদীছ শায না হওয়া

যখন কোন বিশুদ্ধ হাদীছ তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী বিশুদ্ধ হাদীছের বিরোধিতা করে, তখন এই নিম্নতর ছহীহ হাদীছকে শায বলা হয়। আর কোন হাদীছকে ছহীহ হওয়ার জন্য এ ত্রুটি থাকবে না।

শর্ত-৫ : হাদীছে কোন গোপন ইল্লাত না থাকা

ইল্লাত হচ্ছে, হাদীছের গোপন দোষ-ত্রুটি। বাহ্যিকভাবে হাদীছকে ছহীহ মনে হবে কিন্তু বাস্তবতা হল, হাদীছটি ছহীহ নয়। হাদীছের ভিতরে এমন দোষ-ত্রুটি আছে, যা কেবল ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু হাতিম, ইমাম আবু যুরআ', দারাকুৎনী, বায়হাক্বী (রহঃ) প্রমুখদের মত মহান মুহাদ্দিছগণের পক্ষেই জানা সম্ভব। এই ধরনের দোষ-

ত্রুটিকেই উছূলে হাদীছের পরিভাষায় 'ইল্লাত' বলা হয়।

ছহীহ লি-যাতিহীর কাল্পনিক উদাহরণ :

মনে করি, আমাদের নিকটে মাহমূদ নামের একজন ছাত্র শায়খুল হাদীছের বরাত দিয়ে বলল, তিনি বলেছেন, 'টিভিতে বিভিন্ন খেলা দেখা হারাম'। এক্ষণে আমরা দেখব, অত্র খবরের মধ্যে ৫টি শর্ত পূর্ণরূপে পাওয়া যাচ্ছে কি-না।

প্রথমতঃ মাহমূদ ৫ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। পাপ কাজে লিপ্ত হয় না। সে খুব পরহেযগার। রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত যথাযথভাবে পালন করে। কাউকে কখনো ধোকা দেয় না, মিথ্যা বলে না, হাটে-বাজারে ও দোকানে আড্ডা দেয় না এবং সুযোগ পেলেই কুরআন তিলাওয়াত করে। সুতরাং মাহমূদ একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।

দ্বিতীয়তঃ মাহমূদ একজন অত্যন্ত মেধাবী ও নামকরা ছাত্র। কোন বিষয় একবার শুনলেই তার মনে থাকে। সুতরাং তার স্মৃতিশক্তি প্রখর।

নোট : উপরের দু'টি গুণ সম্পন্ন রাবীকে মুহাদ্দিছগণ তাদের পরিভাষায় 'ছিক্বাহ (ثِقَةٌ)' বলেন। যার বাংলা অনুবাদ নির্ভরযোগ্য, মযবূত ও শক্তিশালী করা যায়।

তৃতীয়তঃ সে শায়খুল হাদীছের দারসে নিয়মিত বসে। সুতরাং শায়খুল হাদীছের বরাত দিয়ে কোন কথা নকল করা তার জন্য অসম্ভব নয়। অতএব সানাদ মুত্তাছিল।

চতুর্থতঃ মাহমূদের চেয়ে মেধাবী শায়খুল হাদীছের অন্য কোন ছাত্র তার এই কথার বিরোধিতা করছে না। সুতরাং তার কথা শায নয়।

পঞ্চমতঃ স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি, শায়খুল হাদীছ গুনাহের কাজের বিষয়ে খুব কঠোর। সুতরাং এই জাতীয় ফৎওয়া তার পক্ষ থেকে হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব মাহমূদের কথার মধ্যে কোন ইল্লাতও নেই।

উপরিউক্ত ৫টি শর্ত পূর্ণরূপে পাওয়ার কারণে মাহমূদের প্রদত্ত খবরটি ছহীহ লি-যাতিহী।

বাস্তব উদাহরণ : বুখারী-মুসলিমের অধিকাংশ হাদীছই ছহীহ লি-যাতিহী পর্যায়ের হাদীছ।

সবচেয়ে বিশুদ্ধ সানাদ (أصح الأسانيد):

একেক মুহাদ্দিছের নিকট একেক সানাদ সবচেয়ে বিশুদ্ধ সানাদ হিসাবে বিবেচিত। যেমন-

(ক) ইমাম আহমাদের নিকট সবচেয়ে বিশুদ্ধ সানাদ : ইমাম যুহরী, সালিম, থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে, তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে।

(খ) ইমাম বুখারীর নিকট সবচেয়ে বিশুদ্ধ সানাদ : ইমাম মালেক (রহঃ) নাফে' থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে।

(গ) ইবনু মাঈনের নিকট সবচেয়ে বিশুদ্ধ সানাদ : আ'মাশ ইবরাহীম নাখঈ থেকে, তিনি আলক্বামা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে।

নোট :

(১) আলক্বামা এবং ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) মামা-ভাগিনা। আলক্বামা (রহঃ) ইমাম নাখঈর মামা ছিলেন। দু'জনই কূফার নামকরা ফক্বীহ।

(২) হাদীছের কিতাবগুলোতে যদি শুধু আব্দুল্লাহ বলা হয় এবং পিতার নাম উল্লেখ না করা হয়, তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

(৩) উপরের বিশুদ্ধতম সানাদগুলোর মধ্যে আমরা কোনটাকে কোনটার উপর প্রাধান্য দিব না। বরং সবগুলোকেই উঁচু পর্যায়ের সানাদ বলে গণ্য করব। এছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিছের পক্ষ থেকে যদি অন্য আরো সর্ববিশুদ্ধ সানাদ জানতে পারি, তাহলে সেগুলোও উঁচু পর্যায়ের সানাদ বলে গণ্য হবে।

ছহীহ লি-যাতিহী হাদীছসমূহের স্তর বিন্যাস :

যে হাদীছের মধ্যে উপরে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের ৫টি গুণ যে পরিমাণে পাওয়া যাবে, সে হাদীছের মানের স্তরও সে হিসাবে বাড়বে। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ছহীহ লি-যাতিহী হাদীছ সমূহের মানের উপর ভিত্তি করে নিম্নের স্তর বিন্যাস করেছেন :

১- মুত্তাফাক্ব আলাইহ, তথা যে হাদীছ বুখারী ও মুসলিম গ্রহণ করেছেন।
২- শুধু ছহীহ বুখারীর হাদীছ।
৩- শুধু ছহীহ মুসলিমের হাদীছ।
৪- বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ হাদীছ।
৫- বুখারীর শর্ত অনুযায়ী ছহীহ হাদীছ।
৬- মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ হাদীছ।
৭- যে সমস্ত ছহীহ হাদীছ উপরের ৬ প্রকারের বাইরে।

ফায়দা : দুই হাদীছের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে অত্র বিন্যাস অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরের হাদীছকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

বুখারী-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ :

কোন হাদীছের সকল রাবী যদি ঐ সমস্ত রাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের হাদীছ ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) তাদের ছহীহে গ্রহণ করেছেন, তাহলে সে হাদীছকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলা হয়।

নোট : এই স্তর বিন্যাস থেকে আমাদের মনে হতে পারে, মুত্তাফাক্ব আলাইহ হলেই তা সবচেয়ে বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু এটা একটা ভুল ধারণা। এই স্তরসমূহের বাইরেও অপেক্ষাকৃত বেশী বিশুদ্ধ হাদীছ পাওয়া যেতে পারে। যেমন- মনে করি, তিরমিযীর কোন হাদীছ মাশহূর এবং এর সকল সূত্র বিশুদ্ধ। পাশাপাশি একটা সূত্র আমাদের উপরে বর্ণিত সর্ববিশুদ্ধ সানাদগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সকল মুহাদ্দিছ হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। তাহলে এই হাদীছটি বুখারী-মুসলিমের ঐ হাদীছের উপর প্রাধান্য পাবে, যার সানাদে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নেই। যেমন- বুখারী-মুসলিমের কোন হাদীছ শুধুমাত্র একটি সানাদে বর্ণিত। সানাদের মধ্যে এমন একজন রাবী রয়েছে, যার বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের মাঝে মত-পার্থক্য রয়েছে। হাদীছটি ঐ সমস্ত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত, বুখারী-মুসলিমের যে সমস্ত হাদীছের উপর কিছু মুহাদ্দিছ অভিযোগ করেছেন। তাহলে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হওয়ার পরেও হাদীছটি তিরমিযীর উক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হাদীছের চেয়ে নিম্ন স্তরের বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রকার- হাসান লি-যাতিহী (حسن لذاته)-এর পরিচয় :

সংজ্ঞা : যে হাদীছের মাঝে হাদীছ ছহীহ হওয়ার ৪টি শর্ত পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু রাবীর স্মরণশক্তিতে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তখন তাকে 'হাসান লি-যাতিহী' বলা হয়।

নোট : হাসান হাদীছের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ নিয়ে মুহাদ্দিছগণের মাঝে বিস্তর মতদ্বন্দ্ব আছে। আমরা এখানে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদের উপর নির্ভর করেছি।

উদাহরণ-১ : আমরা ছহীহ লি-যাতিহীর উদাহরণে মাহমূদ নামটি ব্যবহার করেছিলাম। মনে করি, মাহমূদের প্রদত্ত সেই খবরটি শায়খুল হাদীছের পক্ষ থেকে নাঈম আমাদেরকে দিল। তার মধ্যে সকল গুণ পূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

অর্থাৎ সে একজন ন্যায়পরায়ণ, তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি। শায়খুল হাদীছের ছাত্র। শায়খুল হাদীছের পক্ষ থেকে তার কোন খবর বর্ণনা করা অসম্ভব নয়। অতএব সানাদ মুত্তাছিল তথা বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সংযুক্ত। তার চেয়ে ভাল তার কোন পড়ার সাথী তার এই কথার বিরোধিতা করছে না। অতএব খবরটি শাযও নয়। তার বর্ণিত কথায় কোন ইল্লাতও নেই। কিন্তু সব ঠিক থাকলেও তার স্মৃতিশক্তি হালকা দুর্বল। একটা পড়া যেখানে মাহমূদের একবার দেখলেই মুখস্থ হয়ে যায়, সেখানে নাঈমের অন্ততঃপক্ষে দশবার দেখা লাগে। কিন্তু সে আবার এতই দুর্বল নয় যে দশবার দেখার পর যা মুখস্থ হয়, তা কিছুক্ষণ মনে থাকে, তারপর আবার ভুলে যায়। বরং দশবার দেখার পর যা মুখস্থ হয়ে যায়, তা আর ভুলে না। নাঈমের এই স্মৃতিশক্তির হালকা দুর্বলতার কারণে তার প্রদত্ত খবরকে 'হাসান লি-যাতিহী' বলা হবে।

বাস্তব উদাহরণ-২ : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

অর্থাৎ 'যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[২১]

অত্র হাদীছটি তিরমিযীর সানাদে বর্ণিত সকল রাবী মযবূত। একমাত্র মুহাম্মাদ বিন আমর আল-লায়ছীর স্মৃতিশক্তিতে হালকা সমস্যা আছে। সুতরাং হাদীছটি হাসান লি-যাতিহী।

তৃতীয় প্রকার- ছহীহ লি-গইরিহী (صحيح لغيره)-এর পরিচয় :

সংজ্ঞা : শাব্দিক অর্থে, যে নিজে নিজে ছহীহ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, বরং অন্যের সাহায্য নিয়ে ছহীহ হয়, তাকে ছহীহ লি-গইরিহী বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীছ রাবীর স্মরণশক্তির হালকা দুর্বলতার কারণে হাসান লি-যাতিহী হাদীছে পরিণত হয়েছে। সেই হাদীছ যখন বিভিন্ন সানাদ থেকে আসে, তখন হাদীছের দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যায় এবং তখন সে হাদীছকে 'ছহীহ লি-গইরিহী' বলা হয়।

উদাহরণ-১ : নাঈমের মত হালকা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছাত্র আমাদেরকে যে খবরটা দিল, সেই খবরটাই তার মত আরো দশটা ছাত্র দিচ্ছে। তাই আমাদের এটা বলার কোন অবকাশ নেই যে, নাঈমতো দুর্বল, তার কথার কোন ভরসা নেই। কেননা তার মত আরো দশজন একই খবর দেয়ার কারণে খবরটি আর দুর্বল নেই। বরং শক্তিশালী হয়ে গেছে। নাঈম হয়তো ভুলে যেতে পারে বা ভুল করতে পারে। তাই বলে কি দশজনই ভুলে যাবে? তারাও ভুল করবে? এটা সম্ভব নয়। সুতরাং এই রকম বিভিন্ন সানাদ থেকে আসা খবরকে ছহীহ লি-গইরিহী বলা হয়।

বাস্তব উদাহরণ-২ : হাসান লি-যাতিহী হাদীছের উদাহরণে মিসওয়াকের যে হাদীছ আমরা পেশ করেছিলাম সেই হাদীছটি তিরমিযীর অত্র সানাদ ছাড়াও সুনানে ইবনু মাজাহ[২২] সহ বিভিন্ন কিতাবে অনেক সানাদে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীছটি ছহীহ লি-গইরিহী।

চতুর্থ প্রকার- হাসান লি-গইরিহী (حسن لغيره)-এর পরিচয় :

সংজ্ঞা : শাব্দিক অর্থে, যে নিজে নিজে হাসান হওয়ার যোগ্যতা রাখে না; বরং অন্যের সাহায্য নিয়ে হাসান হয়, তাকে হাসান লি-গইরিহী বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে, যখন কোন যঈফ হাদীছ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে বর্জনের স্তর থেকে গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে, তখন তাকে 'হাসান লি-গইরিহী' হাদীছ বলা হয়।

---

২১. সুনানে তিরমিযী হা/২২।
২২. সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৩০২; সুনানে আবিদাঊদ হা/ ৪৭।

নোট :

একটি যঈফ হাদীছ দু'টি শর্তে হাসান লি-গইরিহী হয়। যেমন-

(ক) হাদীছটির যঈফ হওয়ার কারণ অবশ্যই যেন রাবীর পাপ বা মিথ্যাচার না হয়। বরং হাদীছটি যেন রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা নতুবা সানাদ বিচ্ছিন্ন হওয়া কিংবা রাবী মাসতূর হওয়া- এই জাতীয় ত্রুটির কারণে যঈফ হয়।
(খ) যঈফ হাদীছের অন্যান্য সূত্রগুলো যেন তার চেয়ে দুর্বল না হয়। বরং তার সমপর্যায়ের বা তার চেয়ে বেী শক্তিশালী হয়।

সতর্কতা :

বিভিন্ন সানাদ থেকে আসার কারণে যঈফ হাদীছকে 'হাসান' বলার কাজটি অনেক কঠিন। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য দক্ষ মুহাদ্দিছগণের শরণাপন্ন হওয়াই শেষ সমাধান।

উদাহরণ : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

অর্থাৎ 'আমি হানীফ তথা স্বচ্ছ, সহনশীল ও একনিষ্ঠ দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছি'।

এই হাদীছে দু'জন যঈফ রাবী আছে। (এক) আলী বিন ইয়াযিদ আলহানী- হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) তাকে 'যঈফ' বলেছেন। (দুই) মুয়ান বিন রিফায়া- হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) তাকে 'লাইয়িনুল হাদীছ' বলেছেন।

এই হাদীছ আরো অন্যান্য সানাদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাদীছটি আয়েশা (রাঃ)-এর সানাদেও বর্ণিত হয়েছে। ঐ সানাদকে আল্লামা আজলূনী হাসান বলেছেন।[২৩] এছাড়া পবিত্র কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াতও এই হাদীছের শাহেদ বা সাক্ষ্য, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন 'হানীফ'। এই সমস্ত আয়াত ও হাদীছকে সামনে রেখে আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে হাসান লি-গইরিহী বলেছেন।[২৪]

খ. মারদূদ (المردود) :

হাদীছ মারদূদ বা পরিত্যাজ্য হয় দুই কারণে। যথা- (১) রাবী পরিত্যাজ্য হওয়ার কারণে (২) সানাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে।

রাবী পরিত্যাজ্য হওয়ার কারণ ও ধরণ :

রাবী দুই কারণে পরিত্যাজ্য হয়। যথা- (এক) রাবীর ন্যায়পরায়ণতায় ত্রুটি থাকার কারণে। (দুই) রাবীর স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতার কারণে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হল :

রাবীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কিত ত্রম্নটি :

রাবীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কিত মোট ৫টি ত্রুটি রয়েছে। যথা-
১. রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বলা।
২. জনসাধারণের মাঝে দৈনন্দিন কথা-বার্তায় মিথ্যুক হিসাবে পরিচিত।
৩. ফাসিক্ব বা পাপিষ্ঠ।
৪. অপরিচিত।
৫. বিদ'আতী।

---

২৩. কাশফুল খাফা ১/৬১ পৃঃ।
২৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯২৪।

রাবীর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কিত ত্রুটি মোট ৫টি । যথা-

১. অত্যধিক ভুল করা।
২. হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনার সময় গাফিল থাকা।
৩. হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে সন্দেহ-বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাওয়া।
৪. অন্যান্য মযবুত রাবীদের বর্ণিত হাদীছের সাথে মিল না থাকা।
৫. স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়া।

উপরিউক্ত ১০টি ত্রুটি সম্বলিত হাদীছগুলো মোট ৯ ভাগে বিভক্ত। সেগুলো হচ্ছে : ১. মাওযূ' বা জাল ২. মাতরূক ৩. মুনকার ৪. মু'আল্লাল ৫. মুদরাজ ৬. মাক্বলূব ৭. মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ ৮. মুযত্বরিব ৯-১০. মুছাহহাফ-মুহার্রাফ। নিম্নে প্রকারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

রাবীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কিত ত্রুটি থেকে সৃষ্ট হাদীছের প্রকারসমূহ :

১. মাওযূ' (الموضوع):

সংজ্ঞা : শাব্দিক অর্থে, মাওযূ' হল- যা তৈরী করা হয়েছে, যা বানানো হয়েছে। এককথায় 'জাল'। সরকার কর্তৃক মুদ্রিত টাকার পরিবর্তে মানুষ যেমন জাল টাকা তৈরি করে, তেমনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছও মানুষ নিজে থেকে তৈরি করে বা জাল করে। তাই তাকে মাওযূ' বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে, যে রাবী রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বলে, তার বর্ণিত হাদীছ জাল।

জাল হাদীছ বর্ণনা করার কারণ :

যুগে যুগে কয়েকটি কারণে মানুষ রাসূল (ছাঃ)-এর নামে হাদীছ জাল করার মত ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে। যেমন-

(ক) ইহুদী-খৃষ্টানদের মদদ পুষ্ট বাতিল ফিরক্বাগুলো ইসলামকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য নিজেদের পক্ষে জাল হাদীছ তৈরি করেছে।
(খ) মাযহাবী অন্ধভক্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণে নিজের মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে জাল হাদীছ তৈরিতে পিছপা হয়নি অনেকেই।
(গ) খলীফা-বাদশাহদের গোলামী করতঃ তাদের নৈকট্য হাছিলের জন্য তাদের ভুল কৃতকর্মের সাফাই গেয়ে জাল হাদীছ তৈরি করেছে অনেক নামধারী আলেম।
(ঘ) মানুষকে অত্যধিক সৎ আমলের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য কিছু অবুঝ ছূফী বিভিন্ন আমলের ফযীলত বর্ণনায় জাল হাদীছ তৈরি করে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে।

জাল হাদীছের উদাহরণ :

'যদি রাসূল (ছাঃ) না থাকতেন, তাহলে আল্লাহ দুনিয়া তৈরি করতেন না'।[২৫] 'মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নূর তৈরী করেছেন'।[২৬]

জাল হাদীছ থেকে সতর্ক করতে গিয়ে শায়খ আব্দুর রাযযাক ইবনু ইউসুফ তার বহু বক্তব্যে বলেন, 'এ দেশের মাটিতে শতকরা ৯০% তাফসীর মাহফিলে মিথ্যা তাফসীর বলা হয়। এ দেশের শতকরা ৯০ জন বক্তা তাদের বক্তব্যে জাল ও যঈফ হাদীছ বলেন'। অথচ জাল হাদীছ বর্ণনার ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

---

২৫. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।
২৬. ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আল-আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/৮২৭।

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল তার থাকার জায়গা জাহান্নাম'।[২৭] সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীছ সম্পর্কে সতর্কতা অতীব যরূরী। অন্ততঃপক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের হেফাযতের খাতিরে।

জাল হাদীছ সংক্রান্ত কিতাবসমূহ :

সালাফে ছালেহীনগণ জাল হাদীছকে আলাদাভাবে সংকলন করে অনেক কিতাব লিখেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

(১) কিতাবুল মাওযূ'আত (كتاب الموضوعات) - ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ)।

(২) সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)- ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

(৩) আল-আসরার আল-মারফূ'আ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ (الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة) -মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ)।

জাল হাদীছ নির্ণয়ের উপায় :

মুহাদ্দিছগণ অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করে জাল হাদীছ নির্ণয় করেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

(১) রাবী নিজেই স্বীকার করে :

উদাহরণ : নূহ ইবনু আবি মারিয়াম। সে ইকরিমা (রহঃ) থেকে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে কুরআনের ফযীলতে অনেক হাদীছ বর্ণনা করত। যখন তাকে তার বর্ণিত হাদীছগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন সে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে এবং বলে, আমি লোকজনকে দেখছি, তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং আবু হানীফার ফিক্বহ ও ইবনু ইসহাকের যুদ্ধের কাহিনী বিষয়ক বই পড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। এজন্যই আমি কুরআনের ফযীলতে হাদীছ বর্ণনা করি।[২৮]

(২) রাবী যে সানাদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ঐ সানাদের কোন ব্যক্তি জীবিত থাকলে মুহাদ্দিছগণ তাহক্বীক্বের জন্য সরাসরি তার কাছে যান এবং যাচাই করেন।

(৩) ঐ সানাদের কোন ব্যক্তি জীবিত না থাকলে কয়েকটি বিষয় দেখা হয়,

ক- হাদীছ বর্ণনাকারী যে উস্তাদের নাম বলেছেন, সে উস্তাদের সাথে বর্ণনাকারীর কখনো দেখা হয়েছে কি-না তা বিশ্লেষণ করা। এর জন্য ইলমুর রিজালের জ্ঞান থাকা যরূরী। যদি উস্তাদ রাবীর জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করে থাকেন বা দুই জনের জন্মস্থানের মাঝে এত দূরত্ব যে, কারো সাথে কারো দেখা হওয়ার সম্ভাবনাই নেই, তাহলে ধরে নেয়া হবে এই রাবী হয় তার উস্তাদের নাম গোপন করেছেন অথবা মিথ্যা বলেছেন। উভয় অবস্থাতেই হাদীছ অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে

খ- হাদীছ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে রাবী একক কি-না তা যাচাই করা। এক্ষেত্রে হাদীছ বর্ণনাকারী যে উস্তাদের নাম বলেছেন, সে উস্তাদের অন্যান্য ছাত্ররা এই জাতীয় হাদীছ বর্ণনা করে কি-না তা যাচাই করা। এই উদ্দেশ্যে মুহাদ্দিছগণ সেই উস্তাদের ছাত্রদের থেকে তথ্য নিয়ে অথবা তাদের হাদীছের সাথে মিলিয়ে নিয়ে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করেন।

উদাহরণ : মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বাসিম নামের জনৈক রাবী একদা একটি হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আবু হাতেম তাকে শাযান থেকে হাদীছ শুনিয়েছেন, তিনি শু'বা থেকে, তিনি ক্বাতাদা থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে বেশী দামী'। হাদীছ শ্রবণকারী হাদীছটি

---

২৭. ছহীহ বুখারী হা/১২৯১।
২৮. আল-আছার আল-মাওযূ'আহ ফিল আখবারিল মারফূ'আহ হা/১৫।

তার উস্তাদ আবী আলী ইবনু আব্দুর রহীমের নিকট পেশ করলে তিনি বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। আবু হাতেম শাযান থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নি।[২৯]

গ- হাদীছের শব্দে সাহিত্যের ছাপ না থাকা। একদম নিম্ন পর্যায়ের আরবী ভাষা ব্যবহৃত হওয়া।
ঘ- পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের কোন নিশ্চিত মূলনীতির বিরোধী হওয়া।
ঙ- রাবীর নিজ মাযহাবের পক্ষে হাদীছ বর্ণনা করা। তথা শী'আ রাবীর আবুবকর এবং ওমর (রাঃ)-এর বিরোধিতায় রাসূল (ছাঃ)-এর নামে হাদীছ বর্ণনা করা।
এছাড়া আরো অনেক মাধ্যমে মুহাদ্দিছগণ হাদীছের সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করে থাকেন।

নোট : হাদীছ সংকলনের যুগ শেষ। তাই রাসূল (ছাঃ)-এর নামে কেউ মিথ্যা বললে তা নির্ণয় করা কিছুটা হলেও সহজ। হাদীছের যে সমস্ত কিতাব মুহাদ্দিছগণ সংকলন করে গেছেন, তার মধ্যে বর্ণিত হাদীছ যাচাই করা হবে। হাদীছ পেলে সানাদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে। আর না পেলে হাদীছ মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হবে। উল্লেখ্য যে, স্বতন্ত্র হাদীছ গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, ইতিহাস গ্রন্থসহ বিভিন্ন গ্রন্থে মুহাদ্দিছ ও মুফাসসিরগণ সানাদসহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

জাল হাদীছের হুকুম :

হাদীছ জাল করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। হাদীছ জালকারীর ঠিকানা জাহান্নাম। জাল হাদীছ শরী'আতের হুকুম প্রণয়নে বিন্দুমাত্র ধর্তব্য নয়, বরং জাল হাদীছ থেকে সতর্ক করা প্রতিটি আলেমের অবশ্য কর্তব্য।

২. মাতরূক (المتروك):

শাব্দিক অর্থ পরিত্যক্ত। পারিভাষিক অর্থে, যে রাবী জনসাধারণের সাথে দৈনন্দিন আলাপচারিতায় মিথ্যা বলে, তার বর্ণিত হাদীছ মাতরূক।

মাতরূক এবং মাওযূ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য :

রাবীর নামে যদি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যা হাদীছ বলার প্রমাণ থাকে, তাহলে তার বর্ণিত হাদীছ মাওযূ' হবে। পক্ষান্তরে রাবীর নামে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যা বলার কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু রাবী মানুষের সাথে দৈনন্দিন কথা-বার্তায় মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত। এই রাবীর বর্ণিত হাদীছ মাতরূক বলে গণ্য হবে।

মাতরূক হাদীছের হুকুম :

মাতরূক একদম নিম্ন পর্যায়ের হাদীছ। মাতরূক হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ যেমন জায়েয নয়, তেমনি অন্য দুর্বল হাদীছকে শক্তিশালী করার জন্য মাতরূক হাদীছের সাহায্য নেয়াও গ্রহণীয় নয়।

৩. মাজহূল (المجهول):

রাবীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কিত ৫টি ত্রুটির মধ্যে মাজহূল হচ্ছে তৃতীয়। মাজহূলের শাব্দিক অর্থ অপরিচিত, অচেনা। পারিভাষিক অর্থে, যে রাবীর নাম ও অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না, তাকে মাজহূল বলা হয়।

নোট : যেহেতু রাবীর পরিচয়ই জানা যায় না, সেহেতু তার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কেমন করে জানা যাবে! সেজন্য রাবীর অপরিচিতিকে তার ন্যায়পরায়ণতার ত্রুটি হিসাবে গণ্য করেছেন মুহাদ্দিছগণ।

---

২৯. লিসানুল মীযান ৫/২২৯ পৃঃ।

রাবী মাজহূল হওয়ার কারণ :

রাবী সাধারণত তিন কারণে মাজহূল বা অপরিচিত হয় :

(১) রাবীর থেকে হাদীছ বর্ণনাকারীর সংখ্যা অতি অল্প হওয়া। এই জাতীয় রাবীদের জমা করে ইমাম মুসলিম (রহঃ) একটি অতি মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। যার নাম 'আল-উহদান' (الوحدان)।
(২) রাবীর উপাধি ও উপনাম অনেক থাকা। যার মধ্যে কোন এক নামে সে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে অন্য কোথাও তার অপ্রসিদ্ধ উপাধি বা উপনামের মাধ্যমে কেউ হাদীছ বর্ণনা করলে পাঠকের নিকট ঐ রাবী অপরিচিত হয়ে যায়। এই জাতীয় রাবীদের বিষয়ে খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) একটি সুন্দর কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম 'মূযিহু আওহামিল জামঈ ওয়াত-তাফরীক্ব' (موضح أوهام الجمع والتفريق)।
(৩) বর্ণনাকারী কখনো কখনো রাবীর নাম উল্লেখ না করে বলে 'আমাকে একজন ব্যক্তি হাদীছ শুনিয়েছে' বা 'আমাকে একজন শায়খ হাদীছ শুনিয়েছে'।

মাজহূলের প্রকারভেদ :

মুহাদ্দিছগণ মাজহূল হাদীছকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (১) মাজহূলুল আইন (২) মাজহূলুল হাল এবং (৩) মুবহাম। নিম্নে এদের পরিচয় ও হুকুম উল্লেখ করা হল :

(এক) 'মাজহূলুল আইন' (مجهول العين) : পারিভাষিক অর্থে, যে রাবীর নাম জানা যায় কিন্তু তার থেকে হাদীছ বর্ণনাকারী মাত্র একজন, তাকে 'মাজহূলুল আইন' বলা হয়।

'মাজহূলুল আইন'-এর হুকুম :

(ক) জমহূর মুহাদ্দিছগণের নিকটে এই রকম রাবীর বর্ণিত হাদীছ অগ্রহণযোগ্য।

(খ) মাজহূলুল আইন রাবীর বর্ণিত হাদীছকে অন্য কোন দুর্বল হাদীছে শক্তি সঞ্চার করার জন্য সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা যাবে কি? এই মর্মে সঠিক মন্তব্য হচ্ছে, গ্রহণ করা যাবে না। তবে যদি অত্যধিক সূত্রের কারণে যোগ্য কোন মুহাদ্দিছের অন্তর প্রশান্তি পায়, তাহলে গ্রহণ করতে পারে।

(দুই) 'মাজহূলুল হাল' (مجهول الحال): পারিভাষিক অর্থে, যে রাবীর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনাকারীর সংখ্যা একের অধিক। কিন্তু কোন মুহাদ্দিছের পক্ষ থেকে তার মযবূত ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়ে কোন মন্তব্য পাওয়া যায় না। সে রাবীকে 'মাজহূলুল হাল' বলা হয়। যার অপর নাম 'মাসতূর'।

নোট : অনেক মুহাদ্দিছ 'মাসতূর' এবং 'মাজহূলুল হালে'র মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের মতে মাসতূর হচ্ছে, যার প্রকাশ্য ন্যায়পরায়ণতা জানা যায়, কিন্তু অপ্রকাশ্য ন্যায়পরায়ণতা জানা যায় না। অর্থাৎ কোন একজন রাবী সর্ম্পকে সাধারণভাবে এতটুকু জানা যায় যে, সে একজন মুসলিম, ৫ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। কিন্তু তার সম্পর্কে তার পাড়া-প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করে বা তার সাথে থেকে বা সফর করে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়নি। তার স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে কোন মুহাদ্দিছের মন্তব্যও পাওয়া যায়না। এই রকম রাবীকে মাসতূর বলে। পক্ষান্তরে মাজহূলুল হাল হচ্ছে, যার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ন্যায়পরায়ণতা পর্দার আড়ালেই থেকে যায়।

'মাজহূলুল হাল'-এর হুকুম :

ক- মাসতূর বা মাজহূলুল হালের বর্ণিত রিওয়ায়াতও জমহূর মুহাদ্দিছগণের নিকট অগ্রহণীয়। হানাফী মাযহাবের অনেক আলেম বলেছেন, যদি মাসতূর প্রথম দুই শতাব্দী হিজরীর বা তাবেঈদের যুগের মানুষ হন, তাহলে তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে।
খ- মাসতূরের বর্ণিত রিওয়ায়াতের মুতাবা'আত বা শাহেদ পাওয়া গেলে তা হাসান লি-গইরিহি পর্যায়ে উন্নিত হবে।

(তিন) 'মুবহাম' (المبهم) : মুবহামের শাব্দিক অর্থ অস্পষ্ট। পারিভাষিক অর্থে, হাদীছের বর্ণনাকারী যে রাবীর নাম গোপন রাখে, সে রাবীকে মুবহাম রাবী বলা হয়।

উদাহরণ : রাবী হাদীছ বর্ণনার সময় সানাদের কোন ব্যক্তির নাম গোপন করে এবং এই জাতীয় বাক্য ব্যবহার করে যে, 'আমাকে ইরাকের একজন বৃদ্ধ হাদীছ শুনিয়েছেন' অথবা 'আমাকে মিশরের একজন ভাল আলেম হাদীছ শুনিয়েছেন'।

'মুবহাম'-এর হুকুম :

ততক্ষণ পর্যন্ত মুবহাম রাবীর হাদীছ গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না তার নাম জানা যায়।

নোট : (১) বর্ণনাকারী যদি রাবীর নাম উল্লেখ না করে এভাবে বলে, আমাকে একজন মযবূত রাবী হাদীছ শুনিয়েছেন, তাহলে তার হুকুম কি হবে? জমহূর মুহাদ্দিছগণ বলেছেন, তার এই মযবূত বলা গ্রহণ করা হবে না। কেননা এই মুবহাম রাবী বর্ণনাকারীর নিকটে মযবূত হতে পারে, কিন্তু অন্য মুহাদ্দিছের তাহক্বীক্বে সে দুর্বল হতে পারে। তাই রাবীর নাম জানা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। অবশ্য যদি কোন মান্যগণ্য ইমাম এভাবে হাদীছ বর্ণনা করেন, তাহলে তার 'মযবূত' মন্তব্য করাকে গ্রহণের পক্ষে অনেকেই মত দিয়েছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

(২) পূর্বে আমরা দেখেছি, রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীর হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ 'মাওযূ' বলেছেন। সাধারণ কথা-বার্তায় মিথ্যুক ব্যক্তির হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ মাতরূক বা পরিত্যক্ত বলেছেন। কিন্তু অনুরূপভাবে মাজহূল ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছের জন্য মুহাদ্দিছগণ স্বতন্ত্র কোন নাম প্রদান করেছেন বলে জানা যায় না; বরং মাজহূল এবং বিদ'আতীর বর্ণিত হাদীছকে 'আমভাবে যঈফ বলা হয়ে থাকে। মনে রাখা আবশ্যক যে, মাওযূ' ও মাতরূকসহ অগ্রহণযোগ্য হাদীছের সকল প্রকারই ব্যাপকার্থে যঈফ-এর অন্তর্ভুক্ত।

মুবহাম ও মুহমাল :

মুবহাম রাবীর নাম গোপন রেখে শুধু ইশারা করা হয়। যেমন- কেউ বলল, আমাকে আমার চাচা বা দাদা বা আমাদের গ্রামের একজন শায়খ হাদীছ শুনিয়েছে। এখানে চাচা, দাদা ও শায়খ হচ্ছে মুবহাম রাবী। অন্যদিকে মুহমাল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তার নিসবাত গোপন রাখা হয়। যেমন- কেউ বলল, আমাকে সুফিয়ান হাদীছ শুনিয়েছেন। হাদীছের রাবীদের মধ্যে সুফিয়ান নামে দুইজন বিখ্যাত রাবী রয়েছে। সুফিয়ান ছাওরী ও সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা। রাবী অত্র সানাদে সুফিয়ান বলতে ছাওরী না ইবনু উয়াইনা তা উল্লেখ করেননি। তাই সানাদে সুফিয়ানকে মুহমাল বলা হবে।

মাজহূল এবং মুবহাম বিষয়ে লিখিত বই:

(ক) মুবাহামাতুল মাতন ওয়াল ইসনাদ (مبهمات المتن والإسناد)-ওয়ালিউদ্দীন ইবনু যাইনুদ্দীন আল-ইরাক্বী।
(খ) আল-ইশারাত ইলাল মুবহামাত (الإشارات إلي المبهمات) -ইমাম নববী (রহঃ)।

৪. বিদ'আতীর বর্ণিত রিওয়ায়াত (رواية المبتدع) :

রাবীর ন্যায়পরায়ণতার সাথে সম্পর্কিত ৫টি ত্রুটির ৪র্থ ত্রুটি হল বিদ'আত। বিদ'আত শব্দের শাব্দিক অর্থ নতুন সৃষ্টি, যার আগে কোন অস্তিত্ব ছিল না। পারিভাষিক অর্থে, শরী'আতের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি করা, যা শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিদ'আতের প্রকারভেদ :

বিদ'আত দুই প্রকার। যথা- (১) মুকাফফিরা ও (২) মুফাসসিক্বা।

(১) বিদ'আতে মুকাফফিরা : যে বিদ'আত মানুষকে কাফের করে দেয় তাকে বিদ'আতে মুকাফফিরা বলা হয়।

উদাহরণ : সৃষ্টিকর্তা তার কোন সৃষ্টিজীবের মধ্যে প্রবেশ করে দুনিয়াতে আসেন বলে বিশ্বাস করা। এই আক্বীদাকে হুলূলের আক্বীদা বলা হয়। উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তিকে কাফের ফৎওয়া দেওয়া একটি অত্যন্ত জটিল মাসআলা। এই বিষয়ে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর 'ফিতনাতুত তাকফীর' গ্রন্থটি একটি সুন্দর গ্রন্থ।

বিদ'আতে মুকাফফিরার হুকুম : সর্বসম্মতিক্রমে এই রকম বিদ'আতীর হাদীছ গ্রহণ করা হবে না।

(২) বিদ'আতে মুফাসসিক্বা : যে বিদ'আতে মানুষ কাফের হয় না, তাকে বিদ'আতে মুফাসসিক্বা বলা হয়।

উদাহরণ : শবে বরাত বা ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা।

বিদ'আতে মুফাসসিক্বার হুকুম : জমহূর মুহাদ্দিছগণের মতে এই রকম বিদ'আতীর হাদীছ কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে। শর্তগুলো নিম্নরূপ। যথা :

(ক) যদি সে স্বীয় বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী না হয়।
(খ) যদি তার বর্ণিত হাদীছ তার বিদ'আতের পক্ষে না হয়।
(গ) সর্বোপরি যদি সে স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে মযবূত হয়।
(ঘ) যদি সে বিদ'আত ছাড়া অন্য কোন গুনাহের দোষে দোষী না হয়।

নোট : ইয়াযীদ ইবনু হারূন (রহঃ) বলেন, 'প্রত্যেক বিদ'আতীর হাদীছ গ্রহণ কর! যদি সে বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী না হয়। তবে রাফেযী-শী'আদের হাদীছ গ্রহণ কর না। কেননা তারা মিথ্যা বলাকে নেকীর কাজ মনে করে'। ইমাম মালেক (রহঃ)-ও অনুরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন।[৩০]

রাবীর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কিত ত্রুটি থেকে সৃষ্ট হাদীছের প্রকার সমূহ :

রাবীর ন্যায়পরায়ণতার সাথে সম্পর্কিত ৫টি ত্রুটির মধ্যে ৪টি ত্রুটির আলোচনা আমরা শেষ করেছি। যেখান থেকে যঈফ হাদীছের তিনটি প্রকার আমরা জানতে পেরেছি। সেগুলো হল,

(ক) মাওযূ' বা জাল।

(খ) মাতরূক বা পরিত্যক্ত

(গ) মাজহূল ও বিদ'আতীর বর্ণিত হাদীছ।

উক্ত তিনপ্রকারের হাদীছ সাধারণভাবে 'যঈফ' বা অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে। এখন আমরা রাবীর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কিত ৫টি ত্রুটির কারণে সৃষ্ট হাদীছের প্রকারগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

স্নেহের ছাত্ররা! রাবীর স্মৃতিশক্তি সংক্রান্ত ৫টি ত্রুটি আবারো আমরা দেখে নেই- ১- অত্যধিক ভুল ২- অত্যধিক গাফলতি ৩- খারাপ স্মৃতিশক্তি ৪- ওহম বা বিভ্রান্তি ৫- শক্তিশালী রাবীদের বিরোধিতা।

উক্ত ৫টি ত্রুটি থেকে যঈফ হাদীছের ৮টি প্রকার তৈরি হয়। যেমন-

১. মুনকার ২. শায ৩. মু'আল্লাল ৪. মুদরাজ ৫. মাক্বলূব ৬. মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ ৭. মুযত্বরিব ৮. মুছাহ্হাফ-মুহার্‌রাফ।

এখানে কয়েকটি কথা মনে রাখা যরূরী যে,

---

৩০. সালিম, তাইসীরু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ১৩৩।

(ক) রাবীর স্মৃতিশক্তি ভাল না খারাপ তা জানার অন্যতম একটি পথ হচ্ছে, অন্যান্য রাবীর হাদীছের সাথে এই রাবীর হাদীছকে মিলিয়ে দেখা। যদি তার চেয়ে মযবূত রাবী বা অধিকাংশ রাবীদের বর্ণিত হাদীছের সাথে তার বর্ণিত হাদীছের অসঙ্গতি দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে সমস্যা আছে। যদি অসঙ্গতি বেশী থাকে, তাহলে **১**ম দু'টি ত্রুটি তথা অত্যধিক ভুল এবং অত্যধিক গাফেল থাকার আওতায় পড়ে যাবে। তখন রাবীকে বলা হবে 'মুনকারুল হাদীছ'। যদি অসঙ্গতি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে রাবীকে বলা হবে 'সাইয়্যেউল হিফয'। এই হল ৫টি ত্রুটির তিনটি। বাকী থাকল দু'টি। 'ওহম' এবং 'মুখালাফাতুছ ছিকাত'। 'ওহম' মূলত ইল্লাত। আর 'মুখালাফাতুছ ছিকাত' আলাদা কোন প্রকার হিসাবে গণ্য করা যায় না। বরং বাকী ৪টি ত্রুটি জানার পথ হচ্ছে, মুখালাফাতুছ ছিকাত।

(খ) বেশীর ভাগ রাবী ভুলের জন্য প্রসিদ্ধ পাননি, বরং তাদেরকে মযবূত হিসাবে গণ্য করা হয়। যদিও তাদের মযবূতির ধরনের উপর ভিত্তি করে তাদের মধ্যে স্তর নির্ণয় করা হয়। কেউ হাফেয, মুতক্বীন এবং মযবূত। আবার কেউ শুধু মযবূত। হাদীছ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এই সমস্ত মযবূত রাবীদের হাদীছে মাঝে-মধ্যে ভুল বের হয়ে পড়ে। এই জাতীয় রাবীদের উপর স্মৃতিশক্তি বিষয়ক কোন জারাহ বা অভিযোগ আরোপ করা হয় না, বরং যে হাদীছে ভুল পাওয়া যায়, সে হাদীছের উপরেই হুকুম আরোপ করা হয়। এই জাতীয় হুকুম থেকেই বের হয়ে আসে শায, মুদরাজ, মাক্বলূব, মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ, মুযত্বরিব, মুছহ্হাফ-মুহার্‌রাফ। এই প্রকারগুলো ব্যাপকার্থে মু'আল্লালের অন্তর্ভুক্ত। মযবূত রাবীর ভুলের ধরনের উপর ভিত্তি করে উক্ত প্রকারগুলো হয়েছে। মু'আল্লালের সাথে সকল প্রকারের কিছু পার্থক্য রয়েছে, যা প্রকারগুলোর আলোচনায় আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে।

উল্লেখ্য যে, এই কথাগুলো ছাত্রদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো উছূলে হাদীছের কোন বইয়ে সুন্দরভাবে উল্লেখ নেই। এগুলো জানা না থাকলে একজন ছাত্র উছূলে হাদীছ একটু চিন্তা করে পড়লে, তার মনে এমন কিছু প্রশ্ন তৈরি হবে, যার উত্তর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাই কথাগুলো অনেক সাবলীল মনে হলেও এর মধ্যে রয়েছে অনেক কঠিন কিছু প্রশ্নের উত্তর। যারা সেই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, একমাত্র তারাই বুঝতে পারবেন এই কথাগুলোর গুরুত্ব।

মু'আল্লাল (المعلل):

শাব্দিক অর্থে, যার মধ্যে ইল্লাত আছে। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীছের সানাদ বাহ্যিকভাবে ছহীহ মনে হওয়ার পরেও তার মধ্যে কোন গোপন ত্রুটি থাকার কারণে হাদীছকে ছহীহ বলা হয় না, তাকে 'মু'আল্লাল হাদীছ' বলা হয়।

নোট : মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। ভুল করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য। তাই যে যতই মযবূত রাবী হোক না কেন তার ভুল হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। মানুষের এই জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত স্বভাবজাত ভুলকে আরবীতে 'ওহম' বলা হয়। সাধারণত হাদীছের মধ্যে ইল্লাত রাবীর এই ওহম বা মানবিক ত্রুটির কারণেই হয়ে থাকে। তাই ওহমকে রাবীর স্মৃতিশক্তিজনিত একটি ত্রুটি হিসাবে গণ্য করেছেন মুহাদ্দিছগণ। যে হাদীছে রাবীর ওহম হয়, সেই হাদীছকেই মু'আল্লাল বা ইল্লাতযুক্ত হাদীছ বলা হয়।

ইল্লাতের উদাহরণ :

ইবনু শিহাব যুহরী অনেক বড় মাপের একজন মুহাদ্দিছ, ন্যায়পরায়ণ এবং মযবূত। ইমাম বুখারী (রহঃ) বা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) প্রমুখদের মত হাফেযে হাদীছগণের ইবনু শিহাব যুহরী থেকে বর্ণিত প্রায় সব হাদীছ জানা আছে। তিনি কেমন হাদীছ বর্ণনা করেন? কোন্ কোন্ তাবেঈ বা কোন্ কোন্ ছাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন? তার নিকট থেকে কারা কারা হাদীছ বর্ণনা করেন? যারা হাদীছ বর্ণনা করেন, তারা তাঁর কাছে কত দিন থেকেছেন, তাদের সাথী কে কে? ইত্যাদি এসবই তাঁদের অবগতিতে আছে। অন্য দিকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ পড়ে পড়ে এবং মুখস্থ করে তাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের শব্দ শুনলেই তারা বুঝতে পারেন হাদীছটি রাসূল (ছাঃ)-এর কি-না। এখন এমন একটা হাদীছ তারা পেলেন, যা ইবনু শিহাব যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন কিন্তু এমন ছাহাবী থেকে, যার নিকট থেকে সাধারণত তিনি বর্ণনা করেন না। আবার তার কাছ থেকে

শুধুমাত্র একজন ছাত্র হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, ঐ ছাত্রের অন্য কোন সাথী হাদীছটি বর্ণনা করেন নি। অন্যদিকে হাদীছের শব্দ দেখে মনে হচ্ছে, রাসূল (ছাঃ) তো এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন না। তখন মুহাদ্দিছগণ বলেন, এই হাদীছের মধ্যে ইল্লাত আছে। এই জন্য হাদীছটি ছহীহ নয়।

হাদীছের গোপন ত্রুটি বের করার উপায় কি?

১. একটি হাদীছের সকল সূত্র একত্রিত করতে হবে।
২. হাদীছের সকল রাবীর বর্ণনার পার্থক্যের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিতে হবে।
৩. প্রত্যেক রাবীর ছাত্র ও শিক্ষকের বর্ণিত হাদীছ সমূহের ব্যাপারে পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে।
৪. সর্বোপরি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের শব্দের ধরনের উপর গভীর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

নোট : ইমাম বুখারী, ইমাম দারাকুৎনী, ইমাম আহমাদ, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রমুখের মত হাদীছের হাফেযগণই কেবল হাদীছের গোপন ত্রুটি ধরতে সক্ষম।

মু'আল্লাল হাদীছের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহ :

১. কিতাবুল ইলাল (كتاب العلل)- ইবনুল মাদীনী।
২. ইলালুল হাদীছ (علل الحديث) - ইবনু আবি হাতিম।
৩. আল-ইলালুল কাবীর ওয়াল ইলালুছ ছগীর (العلل الكبير والعلل الصغير)- ইমাম তিরমিযী।
৪. আল-ইলাল (العلل)- দারাকুৎনী।

ই'তেবার, মুতাবা'আহ, শাহেদ (الإعتبار والمتابعة والشاهد):

'ই'তেবার'-এর পরিচয় :

হাদীছের বিভিন্ন সানাদ, মুতাবা'আহ ও শাওয়াহেদ খোঁজাকে ই'তেবার বলা হয়। ই'তেবারের উপকারিতা অপরিসীম। হাদীছের সকল সূত্র, মুতাবা'আহ ও শাওয়াহেদ জমা হয়ে গেলে সে হাদীছের প্রকৃত রূপটা সামনে চলে আসে। হাদীছের সানাদের অবস্থা, হাদীছের ব্যাখ্যা, হাদীছে কোন ইল্লাত আছে কি-না ইত্যাদি স্পষ্ট হয়ে যায়।

'মুতাবা'আহ'-এর পরিচয় :

সানাদের কোন রাবীকে একক মনে করার পর যদি দেখা যায়, অন্য এক সানাদে এই রাবীর স্থলে অন্য আরেকজন রাবী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তখন তাকে 'মুতাবা'আহ' বলা হয়।

'শাহেদ'-এর পরিচয় :

যখন কোন হাদীছ একজন ছাহাবীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হওয়ার পর অন্য ছাহাবীর পক্ষ থেকে ঐ হাদীছই হুবহু ঐ শব্দে বা অন্য শব্দে হাদীছের মূল ভাবটা বর্ণিত হয়, তখন তাকে শাহেদ বলে।

উদাহরণ : মনেকরি, আমরা একটি হাদীছ একটি সানাদে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে পেলাম। এখন সেই হাদীছটি হুবহু ঐ বাক্যে হোক বা বাক্যের ভাবার্থে হোক আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে পেলাম, তাহলে এর একটি আরেকটির জন্য শাহেদ।

পার্থক্য : মুতাবা'আয় হাদীছের বর্ণনাকারী ছাহাবী একই থাকে কিন্তু শাহেদের জন্য শর্ত হচ্ছে, বর্ণনাকারী ছাহাবী আলাদা হতে হবে। তবে কোন সময় মুতাবে' এবং শাহেদ একে অপরের স্থানে ব্যবহার হয়।

মুখালাফাতুছ ছিকাত (مخالفة الثقات):

শাব্দিক অর্থে, মযবূত রাবীদের বিরোধিতা করা। আমরা জেনেছি, মু'আল্লাল হাদীছ বের করার পথ হচ্ছে রাবীদের পরস্পরের বিরোধিতা দেখা। রাবীদের পরস্পরের বিরোধিতার উপর ভিত্তি করেই মু'আল্লাল হাদীছ নির্ণয় করা হয়।

মু'আল্লাল হাদীছের যে প্রকারগুলোর আলোচনা আমরা করব, সেগুলোর প্রত্যেকটির ভিত্তি হচ্ছে রাবীদের পরস্পরের বিরোধিতা। সুতরাং মুখালাফাতুছ ছিকাতকে আলাদা কোন প্রকার করার প্রয়োজন নেই।

মু'আল্লাল হাদীছের প্রকারভেদ (أقسام الحديث المعلل) :

১. মুনকার (المنكر):

মুনকার শব্দের শাব্দিক অর্থ অপসন্দনীয়, ঘৃণিত, নিন্দনীয়। পারিভাষিক অর্থে, দুই ধরনের হাদীছকে মুনকার বলা হয়। যেমন-

মুনকারের সংজ্ঞা-১ : যে রাবী অত্যধিক ভুল করে বা যে রাবী হাদীছের ক্ষেত্রে অত্যধিক গাফেল সে রাবীর বর্ণিত হাদীছকে 'মুনকার' বলা হয়।

মুনকারের সংজ্ঞা-২ : অনেক মুহাদ্দিছ মুনকার হাদীছের সংজ্ঞায় বলেছেন, কোন দুর্বল রাবী যখন একাই কোন হাদীছ বর্ণনা করেন, তাকে মুনকার বলা হয়।

ছাত্ররা! অত্র সংজ্ঞায় দু'টি ক্রুটির কারণে তার হাদীছকে মুনকার বলা হচ্ছে। প্রথমতঃ তিনি যঈফ। দ্বিতীয়তঃ এই হাদীছ তিনি একাই বর্ণনা করেছেন।

সংজ্ঞা দু'টির মধ্যে পার্থক্য :

প্রথম সংজ্ঞাতে রাবীর অত্যধিক ভুল করাই হাদীছের মুনকার হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। দ্বিতীয় সংজ্ঞাতে তার সাথে আরো একটি বিষয় সংযুক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে, রাবীর হাদীছ বর্ণনায় একক হওয়া।

মুনকারের সংজ্ঞা-৩ : ফাসেক তথা যে রাবীর কথা ও কাজের মধ্যে স্পষ্টভাবে পাপ প্রকাশ পেয়েছে সে রাবীর বর্ণিত হাদীছকে 'মুনকার' বলা হয়।

নোট :

(ক) আমরা ইতিপূর্বে রাবীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কিত ৪টি ক্রুটি নিয়ে আলোচনা করেছি। শুধু একটিমাত্র ক্রুটি বাকী ছিল তা হচ্ছে রাবীর ফাসিক্ব হওয়া। মুনকারের প্রথম সংজ্ঞায় সেটি চলে এসেছে। মুনকার রাবীর বাকী ক্রুটিগুলো স্মৃতিশক্তি জনিত। সুতরাং মুনকার এমন একটি পরিভাষা, যা উভয় প্রকার ক্রুটিকে নিজের মধ্যে শামিল করে।

(খ) অনেক মুহাদ্দিছ প্রকাশ্য গুনাহগার বা ফাসিক রাবীর হাদীছকে মুনকার বলেননি; বরং তার চেয়ে নিম্নমানের মাতরূক বা পরিত্যক্ত-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাদের নিকটে রাবী ফাসিক্ব হওয়া অনেক বড় ক্রুটি।

(গ) পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ অনেক সময় মাওযূ' বা জাল হাদীছের ক্ষেত্রেও মুনকার শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

(ঘ) মু'আল্লাল হাদীছের ক্ষেত্রেও অনেক সময় মুনকার শব্দটি ব্যবহার হয়। মু'আল্লালের আলোচনা বিস্তারিত পরের অধ্যায়গুলোতে আসছে।

মুনকারের সংজ্ঞা-৪ : যঈফ বা দুর্বল রাবী যদি শক্তিশালী রাবীর বিপরীত হাদীছ বর্ণনা করেন, তাহলে এই দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছকে 'মুনকার' বলা হয়।

২. মাহফূয, শায, মুনকার, মা'রূফ (المحفوظ والشاذ والمنكر والمعروف) :

♦ শায ও মাহফূয :

শায শব্দের শাব্দিক অর্থ হল, জামা'আত থেকে আলাদা হওয়া, একাকী হওয়া। মাহফূয শব্দের শাব্দিক অর্থ সংরক্ষিত, সুরক্ষিত।

পারিভাষিক অর্থে, একজন মযবূত রাবী যদি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী মযবূত রাবী বা সংখ্যাধিক রাবীর বিরোধিতা করে তাহলে তার হাদীছকে 'শায' বলা হয়। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বেশী মযবূত রাবী বা সংখ্যাধিক রাবীর বর্ণিত হাদীছকে 'মাহফূয' বলা হয়।

উদাহরণ :

হাম্মাম ক্বাতাদা থেকে, তিনি হাসান বাছরী থেকে, তিনি সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় নবজাতক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে ঝুলন্ত থাকে। যে আক্বীক্বা ৭ম দিনে করা হয় এবং আক্বীক্বার পশুর রক্ত নবজাতকের মাথায় মাখানো হয়'।[৩১]

হাম্মাম ব্যতীত ক্বাতাদার যত ছাত্র আছেন, সকলেই এই হাদীছটিকে বর্ণনা করার সময় 'আক্বীক্বার পশুর রক্ত নবজাতকের মাথায় মাখানো'-এর পরিবর্তে বলেছেন, 'সন্তানের নাম রাখা হয়'। অথচ হাম্মাম একজন মযবূত রাবী। সুতরাং হাম্মামের বর্ণিত হাদীছ 'শায' এবং ক্বাতাদার অন্য ছাত্রদের বর্ণিত হাদীছ 'মাহফূয'।

নোট : শায ব্যাপকার্থে মু'আল্লাল বা ইল্লাতযুক্ত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হলেও শায এবং ইল্লাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শাযের জন্য বিরোধিতা শর্ত। শুধু তাই নয়, অপেক্ষাকৃত বেশী মযবূত রাবীর বিরোধিতা যরূরী। কিন্তু ইল্লাতের জন্য বিরোধিতা শর্ত নয়। কোন প্রকার বিরোধিতা ছাড়াই শুধু শব্দের অবস্থা বিশ্লেষণ করে মুহাদ্দিছগণ কোন হাদীছকে ইল্লাতযুক্ত বলতে পারেন।

♦ মুনকার ও মা'রূফ :

মুনকার শব্দের শাব্দিক অর্থ অপছন্দনীয়, ঘৃণিত, নিন্দনীয়। মা'রূফ শব্দের শাব্দিক অর্থ পরিচিত, চেনা-জানা। পারিভাষিক অর্থে, দুর্বল রাবী যদি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মযবূত রাবীর বিরোধিতা করেন, তাহলে দুর্বল রাবীর হাদীছকে 'মুনকার' বলা হয়। অন্যদিকে মযবূত রাবীর হাদীছকে 'মা'রূফ' বলা হয়।

মুনকার ও শাযের মধ্যে পার্থক্য :

মুনকার ও শায উভয় প্রকার হাদীছই অগ্রহণযোগ্য। দুই প্রকার হাদীছের জন্যই বিরোধিতা শর্ত। মুনকারে দুর্বল মযবূতের বিরোধিতা করে আর শাযে মযবূত অপেক্ষাকৃত বেশী মযবূতের বিরোধিতা করে।

মা'রূফ ও মাহফূযের মধ্যে পার্থক্য :

মা'রূফ ও মাহফূয উভয় প্রকার হাদীছই গ্রহণযোগ্য। মা'রূফ দুর্বল রাবীর বিরোধিতা করে আর মাহফূয তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী রাবীর বিরোধিতা করে।

উদাহরণ : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের মাঠে ৪টি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এক ধাপ সামনে এগোতে পারবে না। যথা- (১) তার বয়স সম্পর্কে, কোথায় তা ব্যয় করেছে। (২) তার শরীর সম্পর্কে, কোথায় তা ব্যবহার করেছে। (৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথায় থেকে উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে এবং (৪) সে রাসূল (ছাঃ)-এর আহলে বায়তের প্রতি কেমন ভালবাসা রাখত।[৩২]

অত্র হাদীছটি হুসাইন আল-আশক্বার আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সানাদে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটি হুসাইন আল-আশক্বার ছাড়া যত রাবী বিভিন্ন ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাদের কেউই আহলে বায়তের প্রতি

---

৩১. আবুদাঊদ হা/২৮৩৯।

৩২. ত্বাবারাণী, মুজামুল কাবীর হা/১১১৭৭।

ভালবাসার কথা উল্লেখ করেননি। হাদীছটি সুনানে তিরমিযীর ‘ক্বিয়ামতের বৈশিষ্ট্য’ অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে ছহীহ সানাদে এসেছে। সেখানেও একথা উল্লেখ নেই। এদিকে এই রাবীর দু’টি ত্রুটি রয়েছে। (এক) স্মৃতিশক্তি দুর্বল। (দুই) শী‘আ।

এই হাদীছ থেকে আমরা উছূলে হাদীছের দু’টি মাসআলার উদাহরণ পেতে পারি। যেমন-

(১) দুর্বল রাবী যদি মযবূত রাবীর বিরোধিতা করে, তাহলে তার হাদীছ মুনকার।

(২) বিদ‘আতী যদি তার বিদ‘আতের পক্ষে হাদীছ বর্ণনা করে, তাহলে তার বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না। এখানে শী‘আ রাবী আহলে বায়তের বিষয়ে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর আহলে বায়তই হচ্ছে তাদের সব কিছুর ভিত্তি। সুতরাং তার বর্ণিত এই হাদীছটি গ্রহণ করা হবে না।

নোট : শায, মুনকার, মারূফ ও মাহফূয এই প্রকারগুলো সানাদ এবং মূল টেক্সট উভয়ের উপর ভিত্তি করে হয়। অত্র উদাহরণে আমরা দেখলাম, হুসাইন-আল-আশক্বার হাদীছের টেক্সটে মযবূত রাবীদের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু এই বিরোধিতা সানাদেও হয়। মযবূত রাবী হাদীছকে মাওকূফ হিসাবে তথা ছাহাবীর কথা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে কোন দুর্বল রাবী সেই হাদীছকে মারফূ‘ বা রাসূল (ছাঃ)-এর কথা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

৫. মাক্বলূব (المقلوب):

মাক্বলূব শব্দের শাব্দিক অর্থ, পরিবর্তিত, যাকে উল্টানো হয়েছে। পারিভাষিক অর্থে, কোন রাবীর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সানাদের মধ্যে বা মাতনের মধ্যে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি হলে তাকে ‘মাক্বলূব’ হাদীছ বলা হয়।

পরিবর্তনের ধরণ ও উদাহরণ :

কখনো রাবীর নামে উল্টা-পাল্টা হয়ে যায়। যেমন : কা‘ব ইবনু মুররাকে মুররা ইবনু কা‘ব বলে দেয়া হয়। কখনো এক মাতনের সানাদকে আরেক মাতনের সাথে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কখনো রাবী মূল টেক্সটের এক শব্দকে আরেক শব্দের স্থানে বসিয়ে দেয়। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

‘সাত শ্রেণীর মানুষ আরশের নীচে ছায়া পাবে। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে, যার বাম হাত জানে না ডান হাত কি দান করল’। এভাবেই বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় রাবী এই হাদীছটির শব্দ উল্টা-পাল্টা করে বর্ণনা করেছেন,

حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ.

‘যার ডান হাত জানে না বাম হাত কি দান করল’। [৩৩]

অনুরূপ কোন একজন রাবী জানেন, ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে তার ছেলে সালিম সবচেয়ে বেশী হাদীছ বর্ণনা করেন। তাই ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে অন্য রাবীর বর্ণনা করা হাদীছও ভুলক্রমে কখনো কখনো সালিম (রহঃ)-এর সানাদে বর্ণনা করেন। এভাবেই সানাদ ও মাতনে পরিবর্তন হয়ে যায়।

মাক্বলূবের কারণ :

কোন হাদীছের মাতন বা মূল টেক্সট একই রকম কিন্তু সানাদ বিভিন্নরকম, তখন রাবীর নিজের অজান্তেই উল্টা-পাল্টা হয়ে যায়। আবার অনেক সময় মুহাদ্দিছগণের পরীক্ষা নেয়ার জন্য সানাদ ও মাতনের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

---

৩৩. ছহীহ মুসলিম হা/২৪২৭।

মাক্বলূব বিষয়ক গ্রন্থ :

রফউল ইরতিয়াব ফিল মাক্বলূব মিনাল আসমায়ে ওয়াল আলক্বাব (رفع الإرتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب)-খত্বীব বাগদাদী ।

৬. মুদরাজ (المدرج):

মুদরাজ শব্দের <u>শাব্দিক অর্থ,</u> প্রবিষ্ট। <u>পারিভাষিক অর্থে,</u> যে হাদীছের সানাদে বা মাতনে রাবীর পক্ষ থেকে কোন কিছু সংযোজিত করা হয়, তাকে 'মুদরাজ' বলা হয়।

মুদরাজের ধরণ :

রাবীর পক্ষ থেকে এই সংযোজন কখনো সানাদে আবার কখনো মাতনে হয়। যেমন : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

'তোমরা পূর্ণরূপে ও ভালভাবে ওযূ কর। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় ধ্বংস, যাদের গোড়ালি জাহান্নামে'।[৩৪] অত্র হাদীছে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে 'তোমরা ভালভাবে ওযূ কর' এই কথাটা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কথা, রাসূল (ছাঃ)-এর কথা নয়। কিন্তু হাদীছটির কোন রাবী কথাটাকে ভুলক্রমে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা মনে করে বর্ণনা করলেন, বললেন, 'আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ভালভাবে ওযূ কর'। এখন এই হাদীছকে 'মুদরাজ' বলা হবে।

মুদরাজের কারণ :

হাদীছের বিভিন্ন জটিল শব্দ থাকে, যার অর্থ বুঝা যায় না। হাদীছ বর্ণনার সময় রাবী সেটা নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা করে দেন। পরবর্তী রাবী সেটাকে মূল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। এই কারণেই মূলত বেশীরভাগ ইদরাজ সংঘটিত হয়েছে।

মুদরাজ বিষয়ক গ্রন্থ :

তাক্বরীবুল মানহাজ বিতারতীবিল মুদরাজ (تقريب المنهج بترتيب المدرج) -হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী।

৭. মুযত্বরাব (المضطرب):

মুযত্বরাব শব্দের <u>শাব্দিক অর্থ,</u> বিশৃংখলা, এলোমেলো। <u>পারিভাষিক অর্থে,</u> যে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীদের বৈপরীত্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, বৈপরীত্যের মাঝে কোনরূপ সামঞ্জস্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন সে হাদীছকে 'মুযত্বরাব' হাদীছ বলা হয়।

মুযত্বরাব হাদীছের শর্ত :

ইযত্বিরাব সংঘটিত হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। যেমন-

(ক) হাদীছের বৈপরীত্য এমন পর্যায়ে পৌঁছা যে, সামঞ্জস্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

---

৩৪. ছহীহ বুখারী হা/১৬৫।

(খ) হাদীছের মাঝে বৈপরীত্য সৃষ্টিকারী তথা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সকল রাবী মযবূতির দিক দিয়ে একই পর্যায়ের হয়। কেননা যদি কেউ মযবূত হয় এবং আরেকজন দুর্বল হয়, তাহলেতো আর ইযত্বিরাব থাকল না। তখন মযবূত রাবীর বর্ণিত হাদীছকে গ্রহণ করা হবে এবং দুর্বল রাবীরটা পরিত্যাগ করা হবে।

নোট : হাদীছের মধ্যে ইযত্বিরাব সাধারণত সানাদে হয়। মাতনে ইযত্বিরাব কম হয়।

মুযত্বরাব হাদীছের হুকুম :

হাদীছে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মুহাদ্দিছগণ প্রাসংগিক বিভিন্ন দলীলের উপর নির্ভর করে কোন এক পক্ষকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। যদি দলীলের ভিত্তিতে কোন এক পক্ষকে প্রাধান্য দেওয়া যায়, তাহলে হাদীছ আর যঈফ থাকে না। যদি বিশৃঙ্খলা এত কঠিন হয় যে, কোন পক্ষকেই প্রাধান্য দেয়া যাচ্ছে না, তাহলে হাদীছ যঈফ বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقٌّ وَأَصْدَقُ الطِّيَرَةِ الْفَأْلُ.

'পেঁচায় কিছু নেই, বদ নযর সত্য, শুভ ও অশুভ লক্ষণের মধ্যে সত্য হচ্ছে শুভ লক্ষণ'।[৩৫] উক্ত হাদীছে তিনটি সনদ রয়েছে। যেমন-

(১) আলী ইবনু মুবারক ও হারব ইবনু শাদ্দাদ এই হাদীছটি ইয়াহইয়া থেকে, তিনি হাইয়্যা আত-তামীমী থেকে, তিনি তার পিতা হাবিস আত-তামীমী থেকে, তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। অর্থাৎ এই হাদীছটি হাবিস (রাঃ) সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

(২) শায়বান ইবনু আব্দুর রহমান এই হাদীছটি ইয়াহইয়া থেকে, তিনি হাইয়্যা আত-তামীমী থেকে, তিনি তার পিতা হাবিস আত-তামীমী থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে, তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে। অর্থাৎ হাবিস (রাঃ) হাদীছটি সরাসরি রাসূল থেকে নয়, বরং আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মাধ্যম দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এই হল দুই সানাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব।

(৩) আবান আল-আত্তারের রিওয়ায়াতেও হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনাকারী তাবেঈর নাম উল্লেখ করা নেই।

অতএব হাদীছটির মধ্যে ইযত্বিরাব বা বিশৃংখলা রয়েছে। এটি একটি মুযত্বরাব হাদীছ।[৩৬]

৮. মুছাহ্হাফ (المصحف):

মুছাহ্হাফ শব্দটি তাছহীফ থেকে উৎপন্ন। যার শাব্দিক অর্থ, বিকৃত। পারিভাষিক অর্থে, হাদীছ সংকলন করতে গিয়ে হাদীছের খাতা-পত্র পড়তে যে ভুলগুলো হয়, তাকে 'তাছহীফ' বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, মযবূত রাবীগণ হাদীছের শব্দকে যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন, অন্য কেউ সেই শব্দগুলোর জের, যবর ও পেশ এবং নুক্বতা ব্যবহারে ভুল করলে সে হাদীছকে 'মুছাহ্হাফ' বলা হয়।

উদাহরণ : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের পর শাওয়াল মাসের ৬ দিন ছিয়াম রাখল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল'। আরবীতে ৬ এর আরবী হচ্ছে 'সিত্তা' (ستا)। এই হাদীছে আবুবকর আছ-ছুলী তাছহীফ করেছেন। তিনি ستا না বলে شيئا বলেছেন। যার অর্থ দাঁড়ায়, কেউ যদি রামাযানের ছিয়াম রাখার পর শাওয়াল

---

৩৫. মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৬৭৮।

৩৬. হাদীছটির উপর বিস্তারিত জানতে লেখক প্রণীত 'হাদীছ তাহক্বীক্বে আলবানী (রহঃ)-এর মতপরিবর্তন ও সর্বশেষ সিদ্ধান্ত' বইটি পড়ুন! দ্রঃ হা/৬।

মাসের কিছু অংশ ছিয়াম রাখে, তাহলে সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল। এখানে ستا এবং شيئا এই দু'টি শব্দ আকৃতিতে প্রায় একই রকম। এখানে শুধু নুক্বতাতে পরিবর্তন হয়ে গেছে। 'সীন' 'শীন' হয়ে গেছে। 'তা' এর উপরের ফোটা 'ইয়া' এর নীচে চলে এসেছে। এই জাতীয় ত্রুটি শুধু হাদীছের মূল টেক্সটে নয়; বরং সানাদের রাবীর নামেও হয়। যেমন- ইবনুল মাদীনীকে ইবনুল মাদানী পড়া, ইজলীকে আজালী পড়া। ইবনু মাঈনকে ইবনু মুঈন পড়া।

মুছাহ্হাফ হাদীছের কারণ :

বইয়ের পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাওয়া বা অস্পষ্ট লেখার কারণে এই জাতীয় ত্রুটি হয়ে থাকে। রাবী যদি কোন লিখিত হাদীছ গ্রন্থ পায় এবং সেটি কোন উস্তাদের নিকট না পড়েই নিজে থেকে বুঝে হাদীছ বর্ণনা শুরু করে, তাহলে এই জাতীয় ত্রুটি হয়। আজও উস্তাদের কাছে ইলম না শিখলে এই জাতীয় এবং এর চেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ইলম শেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই উস্তাদের শরণাপন্ন হতে হবে।

মুছাহ্হাফ হাদীছের হুকুম :

যদি রাবীর নিকট থেকে তাছহীফ বেশী সংঘটিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে রাবী শায়খের নিকট থেকে ইলম হাছিল করেননি এবং এই তাছহীফ তার জন্য ত্রুটি হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি অল্প সংঘটিত হয়, তাহলে এটা মানবিক ত্রুটি বলে গণ্য হবে।

মুছাহ্হাফ হাদীছের গ্রন্থসমূহ :

১. আত-তাছহীফ (التصحيف)- দারাকুৎনী ।
২. ইছলাহু খতাইল মুহাদ্দিছীন (إصلاح خطأ المحدثين)- খাত্তাবী।
৩. তাছহীফাতুল মুহাদ্দিছীন (تصحيفات المحدثين)- আবু আহমাদ আল-আসকারী।

৯. মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ (المزيد في متصل الأسانيد):

শাব্দিক অর্থে, সংযুক্ত সানাদের মধ্যে অতিরিক্ত রাবী। পারিভাষিক অর্থে, হাদীছের কোন একটি সানাদ সংযুক্ত তথা রাবীদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা নেই, কিন্তু এই হাদীছের অন্য সানাদে এই সংযুক্ত সানাদের মধ্যে নতুন একজন রাবীর নাম বৃদ্ধি করা হয়, তখন এই পরিবর্ধিত রাবীর সানাদকেই 'মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ' বলা হয়।

'মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ'-এর হুকুম-১ :

সানাদের যে স্থানে নতুন রাবীর নাম বৃদ্ধি করা হচ্ছে, ঐ স্থানের রাবী যদি বর্ণনাকারী থেকে হাদীছ শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে নতুন নামযুক্ত সানাদ গ্রহণ করা হবে না। এই অবস্থায় নতুন নামযুক্ত সানাদকে 'মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ' বলা হবে।

'মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ'-এর হুকুম-২ :

সানাদের যে স্থানে নতুন রাবীর নাম বৃদ্ধি করা হচ্ছে, ঐ স্থানের রাবী যদি বর্ণনাকারী থেকে হাদীছ শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার না করে, বরং অস্পষ্টভাবে 'আন' (عن)বলে, তাহলে দেখতে হবে নাম বৃদ্ধিকারী বেশী মযবূত না যিনি নাম বৃদ্ধি করেননি তিনি বেশী মযবূত। রাবী থেকে শ্রবণের ক্ষেত্রে যিনি বেশী গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবেন তার সানাদই প্রাধান্য পাবে।

কাল্পনিক উদাহরণ : মনে কর! মাহফূয ভাই বলেছেন, হাসান ভাইকে আমি বলতে শুনেছি, 'আমি আগামীকাল মদীনা যাচ্ছি'। এখন অন্য একজন এসে বলছে, আমাকে মাহফূয ভাই বলেছেন, তিনি মহসিন ভাইয়ের নিকট থেকে

শুনেছেন, হাসান ভাই বলেছেন, ... । এই যে অন্য একজন এসে মাঝখানে মহসিন ভাইয়ের নাম বৃদ্ধি করল, অথচ প্রথম সানাদে মাহফূয ভাই হাসান ভাইয়ের নিকট থেকে শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন। সুতরাং এই মহসিন ভাইয়ের নামযুক্ত সানাদটাই মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ। আর যদি মাহফূয ভাই হাসান ভাইয়ের নিকট থেকে শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট করে না বলতেন, তাহলে মুহসিন ভাইয়ের নামসহ যে সানাদ এসেছে, এটাই গ্রহণ করা হত এবং প্রথমটাকে বিচ্ছিন্ন বলা হত।

বাস্তব উদাহরণ : আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) সুফিয়ান থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ থেকে, তিনি বলেন, আমাকে বুসর ইবনু ওবায়দুল্লাহ হাদীছ শুনিয়েছেন। হাদীছটি অত্র সানাদে ছহীহ মুসলিমে রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং ছালাত আদায় করো না'। এই হাদীছটি আরো অনেক মযবূত রাবী বর্ণনা করেছেন। তারা কেউই আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের পরে সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেননি, বরং সরাসরি আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। যাদের অনেকেই আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ থেকে ইবনু মুবারকের হাদীছ শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দসহ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে সানাদের মাঝে সুফিয়ান (রহঃ)-এর নাম রয়েছে, সেটাই মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ।[৩৭]

'মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ'-এর গ্রন্থ : তাময়ীযুল মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ (تمييز المزيد في متصل الأسانيد) - খত্বীব বাগদাদী।

মুখতালিত্ব (المختلط) :

আমরা জেনেছি যে, রাবীর স্মৃতিশক্তি জনিত ত্রুটির আধিক্যতার কারণে রাবীর উপর দু'টি হুকুম লাগানো হয়। যদি ত্রুটি বেশী হয়, তাহলে 'মুনকারুল হাদীছ', আর যদি একটু কম হয়, তাহলে 'সাইয়েউল হিফয'। মুনকারুল হাদীছের আলোচনা আমরা উপরে করেছি। এখন সাইয়েউল হিফযের আলোচনা।

'সাইয়েউল হিফয' অর্থ হচ্ছে খারাপ স্মৃতিশক্তি। এটা দুইপ্রকার হয়ে থাকে। যথা : (ক) স্মৃতিশক্তি জনিত স্থায়ী ত্রুটি (খ) স্মৃতিশক্তি জনিত অস্থায়ী ত্রুটি। নিম্নে আলোচনা করা হল :

(ক) স্মৃতিশক্তি জনিত স্থায়ী ত্রন্নটি :

রাবী যদি জন্মগতভাবেই খারাপ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয় এবং হাদীছ বর্ণনায় ভুল করে, তাহলে তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যদি মুতাবা'আত বা শাহেদ পাওয়া যায়, তাহলে হাদীছে শক্তি সঞ্চার হয়ে হাদীছ হাসান লি-গইরিহী হবে।

(খ) স্মৃতিশক্তি জনিত অস্থায়ী ত্রন্নটি :

রাবী জন্মগতভাবে মযবূত স্মৃতিশক্তির অধিকারী। কিন্তু জীবন সংসারের চলমান সংগ্রামে ঘটে যাওয়া কোন কোন ঘটনা রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল করে দেয়। তখন এই রাবীকে 'মুখতালিত্ব' বলা হয়।

'সাইয়েউল হিফয'-এর কারণ :

৩৭. ইমাম তিরমিযী, সুনানে তিরমিযী হা/১০৬৯।

বিভিন্ন কারণে মযবূত রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বার্ধক্য। অনেক মুহাদ্দিছ শুরু জীবনে মুহাদ্দিছ থাকলেও পরবর্তীতে অন্য কোন পেশা গ্রহণ করার ফলে হাদীছ চর্চা কমে যায় এবং হাদীছ বিষয়ে স্মৃতিতে ভাটা পড়ে। এছাড়া কিতাব-পত্র পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়ার কারণে রাবীদের হাদীছ বর্ণনার মধ্যে ভুল-ত্রুটি হয়।

নোট : বার্ধক্যের কারণে ত্রুটি এবং অন্য কারণে ত্রুটির মাঝে মুহাদ্দিছগণ পার্থক্য করে থাকেন। বার্ধক্যের কারণে সৃষ্ট স্মৃতিশক্তির ত্রুটিকে মুহাদ্দিছগণ 'তাগাইয়ুর' বলে থাকেন। এছাড়া বাকী সকল ক্ষেত্রে 'ইখতিলাত্ব' বলে থাকেন।

'সাইয়েউল হিফয'-এর হুকুম :

স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার আগের ও পরের হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করতে হবে। স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার আগে বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হবে। স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার পর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হবে না।

উদাহরণ :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ لاَ تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ.

উক্ববা বিন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মেয়েদের অবহেলা করো না। নিশ্চয় তারা আনন্দদায়ক ও মূল্যবান।[৩৮]

এই হাদীছে আব্দুল্লাহ বিন লাহিয়া নামে একজন রাবী আছেন, যিনি শক্তিশালী। কিন্তু তার মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে তার কিতাবাদীতে আগুন লেগে পুড়ে যায়। ইন্নালিল্লাহ। অতঃপর তিনি মুখস্থ শক্তি থেকে হাদীছ বর্ণনা শুরু করেন। ফলে হাদীছের মধ্যে ভুল হতে থাকে। এই জন্য মুহাদ্দিছগণ তার কিতাব পুড়ে যাওয়ার আগের হাদীছ গ্রহণ করেছেন এবং কিতাব পুড়ে যাওয়ার পরের হাদীছ বর্জন করেছেন।

কিতাব পুড়ে যাওয়ার আগে তার কাছ থেকে যারা হাদীছ শুনেছে এবং স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার পর আর শোনেনি তাদের বিষয়ে ইমাম যাহাবী (রহঃ) মুহাদ্দিছগণের পক্ষ থেকে নকল করে বলেন, 'কিতাব পুড়ে যাওয়ার পূর্বে ৪ জন রাবী তার নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তারা হলেন- (১) আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক (২) আব্দুল্লাহ বিন ওহাব (৩) আব্দুল্লাহ বিন মুকরী এবং (৪) আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা আল-কা'নাবী'।[৩৯]

উপরিউক্ত চারজনের সাথে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) কুতাইবা বিন সাঈদ নামের আরও একজনকে যুক্ত করেছেন। তার সম্পর্কে তিনি বলেন,

قُتَيْبَةُ يَقُوْلُ قَالَ لِي أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أَحَادِيْثُكَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ صِحَاحٌ.

'কুতাইবা বলেন, ইমাম আহমাদ আমাকে বলেছেন, তোমার বর্ণিত ইবনু লাহিয়ার হাদীছ ছহীহ'।[৪০] উল্লেখিত হাদীছটি এই কুতাইবা বিন সাঈদ (রহঃ) ইবনু লাহিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীছটি ছহীহ।

---

৩৮. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৪১১।
৩৯. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/১১ পৃঃ।
৪০. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/১৭ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(الفصل الثالث)

সানাদে বিচ্ছিন্নতা থাকার দিক দিয়ে হাদীছের প্রকারভেদ

(أقسام الحديث باعتبار إتصال السند وإنقطاعه)

আমরা জেনেছিলাম যে, হাদীছ দুই কারণে দুর্বল হয়। যথা- রাবীর কারণে অথবা সানাদের বিচ্ছিন্নতার কারণে। রাবীর সাথে সম্পর্কিত ত্রুটিগুলো আবার দুই প্রকার। যথা- রাবীর ন্যায়পরায়ণতা এবং রাবীর স্মৃতিশক্তি। উভয় প্রকার ত্রুটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি। ফালিল্লাহিল হামদ্। এক্ষণে আমরা সানাদের বিচ্ছিন্নতার কারণে হাদীছ যঈফ হওয়া নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সানাদের বিচ্ছিন্নতা দুই প্রকার। যথা- (এক) প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা (দুই) অপ্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা (الإنقطاع الظاهر)

যে বিচ্ছিন্নতা ধরার জন্য হাদীছ বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং হাদীছের একজন ত্বলেবে ইলমও চেষ্টা করলে যে বিচ্ছিন্নতা ধরতে পারবে, তাকেই 'প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা' বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, সানাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কখনো শুরুতে হয়, আবার কখনো শেষে হয়, কখনো মাঝেও হয়। সানাদের বিচ্ছিন্নতার এই ধরণের উপর ভিত্তি করেই মূলত হাদীছের এ বিষয়ক প্রকারগুলো হয়ে থাকে। মুহাদ্দিছগণের বিশ্লেষণে যা ৪ প্রকার। যথা : (১) মু'আল্লাক্ব (২) মুরসাল (৩) মু'যাল ও (৪) মুনক্বাতে'। নিম্নে আলোকপাত করা হল :

(১) মু'আল্লাক্ব (المعلق):

মু'আল্লাক্বের শাব্দিক অর্থ, ঝুলন্ত। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীছের সানাদে শুরুর দিক থেকে রাবী বিলুপ্ত হয়ে যায়, সে হাদীছকে 'মু'আল্লাক্ব' বলা হয়। সাধারণত এই বিলুপ্তিটা হাদীছ সংকলকদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যেমন : ইমাম বুখারী (রহঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করলেন কোন সানাদ ছাড়াই। এখানে শুধু সংকলক ইমাম বুখারীর নাম জানা যাচ্ছে, তারপরে আর কোন রাবীর নাম জানা যাচ্ছে না। এই রকম হাদীছকে মু'আল্লাক্ব হাদীছ বলা হয়।

উদাহরণ : 'বুলূগুল মারাম' এবং 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর সকল হাদীছ মু'আল্লাক্ব।

মুআ'ল্লাক্ব হাদীছের হুকুম :

মু'আল্লাক্ব হাদীছের সানাদ যদি অন্য কোন মাধ্যমে জানা যায়, তাহলে সেই সানাদের উপর ভিত্তি করে হাদীছের উপর হুকুম লাগানো হবে। আর যদি অন্য কোন মাধ্যমে পাওয়া না যায়, তাহলে হাদীছ 'যঈফ' বলে গণ্য হবে। 'বুলূগুল মারাম' ও 'মিশকাতুল মাছাবীহে'র সকল হাদীছ অন্য কিতাবগুলোতে সানাদসহ পাওয়া যায়। অতএব ঐ সানাদগুলোর উপর ভিত্তি করেই হাদীছের উপর হুকুম লাগানো হবে।

বুখারীতে বর্ণিত মু'আল্লাক্ব হাদীছ :

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ বুখারীতে অনেক মু'আল্লাক্ব হাদীছ সংকলন করেছেন। এই সমস্ত মু'আল্লাক্ব হাদীছের কোন সানাদ তিনি উল্লেখ করেননি।

কারণ : ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর 'ছহীহ' গ্রন্থে অধ্যায় ভিত্তিক হাদীছ নিয়ে আসেন। কিন্তু তার অধ্যায় ও হাদীছের মাঝে অনেক সময় বাহ্যিক মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। তিনি অনেক গভীর থেকে এবং সূক্ষ্মভাবে মাসআলা উদঘাটন করে থাকেন। এজন্যই বলা হয় 'ফিক্বহুল বুখারী ফী তারাজিমিহী' অর্থাৎ 'ছহীহ বুখারীর অধ্যায়গুলোই হচ্ছে ইমাম বুখারীর ফিক্বহ'। হাদীছ ও অধ্যায়ের মাঝে সামঞ্জস্যের এই কঠিনতা দূর করার জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনার পর তার অধীনে মূল হাদীছ নিয়ে আসার আগে অধ্যায় এবং হাদীছের মাঝে বিভিন্ন আয়াত ও

মু'আল্লাক্ব হাদীছ নিয়ে আসেন। যার ফলে তাঁর রচিত অধ্যায় এবং আনীত হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য করা সুবিধা হয়।

ছহীহ বুখারীর মু'আল্লাক্ব হাদীছের হুকুম :

(ক) যদি ইমাম বুখারী 'জাযম' বা নিশ্চয়তা সূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনা করেন, তাহলে গ্রহণ করা হবে। 'জাযম' বা নিশ্চয়তা সূচক শব্দের উদাহরণ হচ্ছে, ইমাম বুখারী (রহঃ) সরাসরি বলেছেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন। একথার মধ্যে কোনরূপ দুর্বলতা নেই। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এই জাতীয় শব্দ দিয়ে তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হবে।

(খ) ইমাম বুখারী (রহঃ) যদি দুর্বলতা সূচক শব্দ ব্যবহার করেন, তাহলে গ্রহণ করা হবে না। যেমন : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে 'বর্ণিত হয়েছে', 'বর্ণিত আছে', 'বলা হয়ে থাকে', 'নকল করা হয়ে থাকে', 'প্রচলিত আছে' ইত্যাদি শব্দ দুর্বলতা সূচক শব্দ, যা হাদীছের 'যঈফ' হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে।

(গ) 'তাগলীকুত তা'লীক্ব'। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর অন্যতম একটি কিতাব। এই কিতাবে তিনি ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত সকল মু'আল্লাক্ব হাদীছের সানাদ উল্লেখ করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন সরাসরি হাদীছের সানাদের উপর ভিত্তি করে ফায়ছালা করা হবে।

নোট : ছহীহ বুখারীর মু'আল্লাক্ব হাদীছ সমূহ মূল বুখারীর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং মু'আল্লাক্ব হাদীছ 'যঈফ' পাওয়া গেলে ছহীহ বুখারীতে 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে মর্মে মন্তব্য করা বোকামি বৈ কিছু নয়।

(২) মুরসাল (المرسل):

মুরসালের শাব্দিক অর্থ, প্রেরিত, পাঠানো। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীছের সানাদের শেষের দিক হতে রাবী বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাকে 'মুরসাল' বলা হয়। অর্থাৎ তাবেঈর পরে রাবীর নাম গোপন থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, কোন তাবেঈ সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে নিসবাত বা সম্বন্ধ করে কোন হাদীছ বর্ণনা করলে তাকে মুরসাল হাদীছ বলা হয়। কেননা একজন তাবেঈ সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছ শুনতে পারেন না। তার মাঝে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মাঝে কোন রাবী অবশ্যই গোপন আছে।

নোট : মুরসাল হাদীছের সানাদ ছহীহ-যঈফ দু'টিই হতে পারে। তথা সংকলকের নিকট থেকে তাবেঈ পর্যন্ত হাদীছের সানাদে কোন বিচ্ছিন্নতা ও ত্রুটি না থাকলে তা 'ছহীহ মুরসাল' বলে গণ্য হবে আর ত্রুটি থাকলে 'যঈফ মুরসাল' বলে গণ্য হবে। সুতরাং মুরসাল হাদীছকে কেউ ছহীহ বললে এর দ্বারা পুরো হাদীছের বিশুদ্ধতা উদ্দেশ্য হয় না। বরং শুধু মুরসাল সানাদের বিশুদ্ধতা উদ্দেশ্য হয়। সানাদ ছহীহ হওয়ার পরেও হাদীছটি মুরসাল হওয়ার কারণে 'যঈফ' বলে গণ্য হবে। তবে অবশ্যই 'যঈফ মুরসালে'র উপর 'ছহীহ মুরসাল' প্রাধান্য পাবে। ছহীহ মুরসাল দিয়ে কোন দুর্বল হাদীছে শক্তি সঞ্চার করা যেতে পারে। শাহেদ বা মুতাবা'আতের কারণে ছহীহ মুরসাল হাদীছ হাসান লি-গইরিহী হাদীছে পরিণত হতে পারে।

মুরসাল হাদীছের হুকুম : ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেছেন,

الْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِى أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

'আমাদের মূল কথা এবং হাদীছ বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য হচ্ছে, মুরসাল রিওয়ায়াত হুজ্জাত বা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়'।[৪১]

---

৪১. মুকাদ্দিমা মুসলিম, হাদীছে মু'আন'আন নিয়ে আলোচনা অধ্যায়।

মুরসাল হাদীছ যঈফ হওয়ার কারণ :

তাবেঈ যখন কোন হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তাঁর মাঝে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মাঝে একজন রাবী গোপন থাকেন, যার পরিচয় জানা যায় না। সেই রাবী একজন তাবেঈও হতে পারেন, একজন ছাহাবীও হতে পারেন। তবেঈগণ শুধু ছাহাবীগণের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন এমনটি নয়; বরং তাঁরা অন্য তাবেঈগণের কাছ থেকেও হাদীছ বর্ণনা করেন। যার অগণিত উদাহরণ হাদীছের ভাণ্ডারে আছে। সুতরাং যতক্ষণ না এই গোপন রাবীর পরিচয় জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ মুহাক্কিক্ব মুহাদ্দিছগণের নিকটে মুরসাল হাদীছ অগ্রহণযোগ্য।

ইখতিলাফ ও কারণ :

মুরসাল হাদীছ নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)সহ অনেকের মতে তা গ্রহণযোগ্য। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)সহ অনেকের নিকটে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের জানা উচিত যে, প্রতিটি ইখতিলাফের পিছনে কোন না কোন কারণ থাকে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (রহঃ) তাবেঈগণের যুগে বাস করতেন। তাই তাঁরা তাবেঈগণের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানতেন। কোন্ তাবেঈ মযবূত, কোন্ তাবেঈ শুধুমাত্র ছাহাবীগণের পক্ষ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তাবেঈগণের যুগে বাস করার কারণে এই বিষয়গুলো তাঁদের নখদর্পণে ছিল। এজন্য তারা এই মাসআলা নিয়ে অতটা সমস্যার সম্মুখীন হননি। স্বীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী তাবেঈগণের হাদীছ গ্রহণ করেছেন ও বর্জন করেছেন। এজন্য তাঁদের পক্ষ থেকে মুরসাল হাদীছ গ্রহণের বিষয়টি ব্যাপকতা লাভ করেনি। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ যেহেতু তাবেঈগণের যুগ পাননি, সেহেতু তাঁরা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাবেঈগণের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রচুর যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। এজন্য তাঁদের নিকট থেকে মুরসাল হাদীছ গ্রহণ না করার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে কোন ইমামই ‘আমভাবে সকল তাবেঈর রিওয়ায়াত গ্রহণ করতেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং বর্ণনাকারী তাবেঈর অবস্থার উপর নির্ভর করতেন। সুতরাং পরবর্তী মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য নিঃসন্দেহে অগ্রাধিকারযোগ্য।

মুরসালের স্তরভেদ :

তাবেঈর বৈশিষ্ট্যভেদে মুরসাল হাদীছের স্তরের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়। যেমন- সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহঃ)-এর মুরসাল সবচেয়ে বিশুদ্ধ মুরসাল। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর মুরসালকে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেননা তার দু’টি বৈশিষ্ট্য ছিল। যথা : (১) তিনি মযবূত রাবী ছাড়া অন্যের কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন না। (২) তাঁর বর্ণিত প্রায় সব হাদীছ ছাহাবীগণের নিকট থেকে বর্ণিত। অন্যদিকে ইমাম যুহরী বা হাসান বছরী (রহঃ)-এর বর্ণিত মুরসাল হাদীছ নিম্ন পর্যায়ের মুরসাল হাদীছ।

ছাহাবীর বর্ণিত মুরসাল হাদীছ :

কোন ছাহাবী যদি সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন, কিন্তু তিনি সেই হাদীছ সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে শুনেননি, তাহলে সেই হাদীছকে ‘ছাহাবীর মুরসাল’ বলা হয়।

উদাহরণ : ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও ইবনু ওমর (রাঃ)। তাঁরা অল্প বয়স্ক ছাহাবী ছিলেন। এই জন্য অনেক ঘটনা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে ঘটে গেছে, যা তাঁরা দেখেননি। কিন্তু তারপরেও তাঁরা সেই ঘটনাগুলো বা সেই হাদীছগুলো সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁদের বর্ণিত এই হাদীছগুলোকেই ছাহাবীর মুরসাল বলা হয়। মূলত তারা এই হাদীছগুলো অন্য ছাহাবীদের নিকট থেকে শুনে বলেছেন।

‘ছাহাবীর বর্ণিত মুরসাল হাদীছ’-এর হুকুম :

ছাহাবীর নাম গোপন থাকলে তা হাদীছের সানাদে কোন ক্ষতি করে না। কেননা সকল ছাহাবী (রাঃ) ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং ইবনু আব্বাস (রাঃ) কোন ছাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি হাদীছ বর্ণনা করলে তা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

মুরসাল হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থ :

(১) আল-মারাসীল (المراسيل)- আবুদাঊদ।
(২) আল-মারাসীল (المراسيل)- ইবনু আবী হাতিম
(৩) জামিঊত তাহছীল লি আহকামিল মারাসীল (جامع التحصيل لأحكام المراسيل)- আলায়ী।

(৩) মু‘যাল (المعضل):

মু‘যালের শাব্দিক অর্থ হল, জটিল। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীছের সানাদে পরস্পর একাধিক রাবী বিলুপ্ত হয়ে যায় সে হাদীছকে ‘মু‘যাল’ হাদীছ বলা হয়।

মু‘যাল হাদীছের হুকুম :

মু‘যাল নিম্ন পর্যায়ের দুর্বল হাদীছ। মুতাবা‘আত এবং শাহেদের মাধ্যমে এই হাদীছে শক্তি সঞ্চার করা যাবে না।

(৪) মুনক্বাতে‘ (المنقطع):

যে হাদীছের সানাদে একজন রাবী বিলুপ্ত হয়ে যায় তাকে মুনক্বাতে‘ হাদীছ বলা হয়।

নোট : বিচ্ছিন্নতার কারণে সৃষ্ট উপরে আলোচিত হাদীছের সকল প্রকারগুলোকে ব্যাপকার্থে মুনক্বাতে‘ হাদীছ বলা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুরসাল, মু‘যাল ও মু‘আল্লাক্ব হাদীছগুলো মুনক্বাতে‘ হাদীছের অর্ন্তভুক্ত।

অপ্রকাশ্য বা অস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা (الإنقطاع الخفي)

যে বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে অবগতি লাভ কেবলমাত্র বিজ্ঞ মুহাদ্দিছগণের পক্ষেই সম্ভব, সেই বিচ্ছিন্নতাকে ‘অস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা’ বলা হয়। অস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা দুই প্রকার। যথা : (ক) মুদাল্লাস ও (খ) মুরসাল খফী। নিম্নে আলোকপাত করা হল :

(ক) মুদাল্লাস (المدلس):

মুদাল্লাস শব্দটি ‘তাদলীস’ ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। এর শাব্দিক অর্থ, ক্রেতার নিকটে পণ্যদ্রব্যের ত্রুটি গোপন রাখা। পারিভাষিক অর্থে, যে হাদীছকে একজন রাবী তার শায়খের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, অথচ তিনি তা তার এই শায়খের নিকট থেকে শুনেননি। যদিও অন্য অনেক হাদীছ তিনি এই শায়খের নিকট থেকে শুনেছেন। এরকম হাদীছকে ‘মুদাল্লাস’ বলা হয়।

নোট : উক্ত সংজ্ঞাটি সাধারণভাবে তাদলীসের সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার যখন তাদলীসের প্রকারভেদ করা হয়, তখন এটাকে ‘তাদলীসুল ইসনাদে’র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক কথায় সাধারণ তাদলীসটাই তাদলীসুল ইসনাদ।

তাদলীসের প্রকারভেদ :

তাদলীস দুই প্রকার। যথা (এক) তাদলীসুত তাসবিয়া (দুই) তাদলীসুশ শুয়ূখ।

(এক) তাদলীসুত তাসবিয়া (تدليس التسوية) :

হাদীছ বর্ণনার সময় রাবী এমন দু’জন মযবূত রাবীর মধ্যবর্তীস্থান থেকে একজন দুর্বল রাবীকে বিলুপ্ত করে দেয়, যে দু’জন মযবূত রাবীর পরস্পরের মাঝে সাক্ষাৎ প্রমাণিত।

উদহরণ : মনে কর! ‘ক’ হাদীছ বর্ণনা করে ‘খ’ থেকে, সে ‘গ’ থেকে। ‘ক’ একজন মযবূত রাবী, ‘খ’ একজন দুর্বল রাবী এবং ‘গ’ একজন মযবূত রাবী। এদিকে আবার ‘ক’ এবং ‘গ’-এর মাঝে সাক্ষাৎ প্রমাণিত। এখন ‘ক’-এর একজন মুদাল্লিস ছাত্র এই সানাদে হাদীছ বর্ণনা করার সময় মধ্যে থেকে ‘খ’ কে বিলুপ্ত করে দেয় এবং বলে আমাকে হাদীছ শুনিয়েছে ‘ক’ তিনি ‘গ’ থেকে।

তাদলীসুত তাসবিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ দুইজন রাবী :

(১) বাক্বিয়্যা ইবনু ওয়ালিদ।

(২) ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম।

বাস্তব উদাহরণ :

বাকিয়্যা ইবনু ওয়ালীদ আবু ওহাব আল-আসাদী থেকে তিনি নাফি‘ থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لا تحمدوا إسلام امرىء حتى تعرفوا عقدة رأيه.

‘তোমরা কোন ব্যক্তির ইসলামের প্রশংসা করো না, যতক্ষণ না তার চিন্তার বাস্তবতা জানতে পার’।

আবু হাতেমের ছেলে তার পিতাকে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এই হাদীছের মধ্যে এমন ঘাপলা আছে, যা খুব কম জনই বুঝতে পারে। শোন! আবু ওহাব আল-আসাদী মূলত ওবায়দুল্লাহ ইবনু আমর। তিনি এই হাদীছটি ইসহাক ইবনু আবি ফারওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নাফে‘ থেকে তিনি ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে। এই সানাদের ওবায়দুল্লাহ ইবনু আমর এবং নাফে‘ (রহঃ) মযবূত রাবী। মধ্যের ইসহাক ইবনু আবি ফারওয়া একজন মাতরূক রাবী। মুদাল্লিস বাকিয়্যা যখন এই হাদীছটি বর্ণনা করেন, তখন তিনি মধ্য থেকে ইসহাক্বকে বিলুপ্ত করে দেন এবং কেউ যেন সহজে ধরতে না পারে সেজন্য ওবায়দুল্লাহ ইবনু আমর-এর সরাসরি নাম ব্যবহার না করে তার উপনাম আবু ওহাব আল-আসাদী ব্যবহার করেছে।[৪২]

‘তাদলীসুত তাসবিয়া’-এর হুকুম :

তাদলীসুত তাসবিয়া নিকৃষ্ট পর্যায়ের তাদলীস। ইমাম শু‘বার নিকটে তাদলীসুত তাসবিয়া এবং মিথ্যা বলা সমান।

(দুই) তাদলীসুশ শুয়ূখ (تدليس الشيوخ) :

হাদীছ বর্ণনার সময় রাবী নিজের শায়খের নাম গোপন করার চেষ্টা করে এবং শায়খের প্রসিদ্ধ নাম ব্যবহার না করে অপরিচিত উপনাম বা উপাধি ব্যবহার করে, তাকে ‘তাদলীসুশ শুয়ূখ’ বলে।

উদাহরণ : আত্বিয়্যা আল-আওফী একজন দুর্বল রাবী। তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে হাদীছ শুনেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তিনি মিথ্যুক কালবীর নিকট থেকে হাদীছ শোনা শুরু করেন। এই মিথ্যুক কালবীর উপনাম আবার আবু সাঈদ। এখন হাদীছ বর্ণনার সময় আত্বিয়্যা শুধু বলেন, আমাকে আবু সাঈদ হাদীছ শুনিয়েছেন। ফলে শ্রবণকারী বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। অনেকেই মনে করেন, তিনি মনে হয় আবু সাঈদ বলতে ছাহাবী খুদরী (রাঃ)-কে বুঝাচ্ছেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য হত মিথ্যুক কালবী।[৪৩]

মুদাল্লিস রাবীর রিওয়াতের হুকুম :

---

৪২. ইবনু আবী হাতিম, ইলালুল হাদীছ হা/১৯৫৭।

৪৩. তাক্বরীবু মুছত্বলাহিল হাদীছ, নাছরুল্লাহ মিশরী, পৃঃ ২৮।

মুদাল্লিস রাবীর হাদীছ শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করা হবে। যদি সে তার শায়খের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে হাদীছটি গ্রহণীয় হবে। আর যদি শায়খের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণের বিষয়ে অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে তথা 'আন' (عن)-এর মাধ্যমে রিওয়ায়েত করে, তাহলে তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে না। মনে রাখা যরূরী যে, এই শর্ত মুদাল্লিস রাবী কর্তৃক বর্ণিত প্রতিটি হাদীছের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে প্রযোজ্য হবে।

মুদাল্লিস হাদীছের গ্রন্থসমূহ :

(১) আত-তাদলীস লি আসমাইল মুদাল্লিসী (التدليس لأسماء المدلسين)-খত্বীব বাগদাদী।

(২) তা'রীফু আহলিত তাক্বদীস বি মারাতিবিল মাওছূফীন বিত তাদলীস (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)-হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী।

খ. মুরসাল খফী (المرسل الخفي) :

শাব্দিক অর্থ গোপন ইরসাল। পারিভাষিক অর্থে, রাবী এমন ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, যিনি তার সমকালের বা যার সাথে তার সাক্ষাৎ প্রমাণিত, কিন্তু তার থেকে কোন হাদীছ শ্রবণ করেননি এবং হাদীছ বর্ণনার সময় শ্রবণের বিষয়ে অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করেন।

মুরসাল খফী ও তাদলীসের মধ্যে পার্থক্য :

মুদাল্লিস রাবী যে শায়খের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করে তার থেকে তিনি অনেক হাদীছ শ্রবণ করেছেন, কিন্তু যে হাদীছে তাদলীস করেছেন, সে হাদীছটি শ্রবণ করেননি। আর ইরসালে খফী হচ্ছে, রাবী এমন শায়খের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, যার নিকট থেকে তিনি কোন দিন কোন হাদীছ শোনেননি কিন্তু তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

মুরসাল খফী হাদীছের গ্রন্থ :

কিতাবুত তাফছীল লি মুবহামিল মারাসীল (كتاب التفصيل لمبهم المراسيل) -খত্বীব বাগদাদী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(الفصل الرابع)

সানাদ পৌঁছার দিক দিয়ে হাদীছের প্রকারভেদ

(أقسام الحديث بإعتبار وصوله)

সানাদ শেষ পর্যন্ত পৌঁছার দিক দিয়ে হাদীছ তিন প্রকার। যেমন- (১) মারফূ‘ (২) মাওকূফ ও (৩) মাক্বতূ‘। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা করা হল :

১. মারফূ‘ (المرفوع):

যে হাদীছের সানাদ রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে, তাকে মারফূ‘ হাদীছ বলা হয়।

মারফূ‘ হাদীছের প্রকারভেদ :

মারফূ‘ হাদীছ দুই প্রকার। যথা- (ক) প্রত্যক্ষ মারফূ‘ হাদীছ (খ) পরোক্ষ মারফূ‘ হাদীছ।

প্রত্যক্ষ মারফূ‘ হাদীছ (المرفوع صريحا)-এর পরিচয় :

যে হাদীছে ছাহাবায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে বর্ণনা করেছেন, তাকে ‘প্রত্যক্ষ মারফূ‘ হাদীছ’ বলা হয়।

পরোক্ষ মারফূ‘ হাদীছ (المرفوع حكما)-এর পরিচয় :

যে হাদীছে স্পষ্টভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা কাজ ও মৌনসম্মতির উল্লেখ থাকে না; বরং হাদীছটি কোন ছাহাবীর কথা বা ফৎওয়া হয়। তবে এমন কিছু দলীল পাওয়া যায়, যা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে, তখন সে হাদীছকে পরোক্ষ মারফূ‘ বা মারফূ‘ হাদীছের হুকুমে ধরে নেয়া হয়।

পরোক্ষ মারফূ‘ হাদীছের শর্তাবলী :

মাওকূফ হাদীছ তথা ছাহাবীদের কথা ও কাজের মধ্যে নিম্নের শর্তাবলী থাকলে তা মারফূ‘ হাদীছ হিসাবে ধরে নেয়া হবে :

(১) যদি সে মাওকূফ হাদীছটি ইজতেহাদ যোগ্য মাসআলা না হয়।
(২) যদি সেই মাওকূফ হাদীছটি অতীতের কোন কিতাবে বর্ণিত না হয়।
(৩) যদি সেই মাওকূফ হাদীছটি এমন বিষয়ের খবর দেয়, যা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা জানা অসম্ভব।

উদাহরণ : মনে কর! আবু হুরায়রা (রাঃ) কোন কথা বললেন, যা কোন হাদীছ বা কুরআন থেকে উদঘাটন করা কোন ইজতেহাদী মাসআলা নয়। কথাটা তাওরাত ও ইঞ্জীলের কোথাও নেই এবং এই রকমও নয় যে, বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে চিন্তা করে বলা যায়। বরং আখিরাত বা পরকালীন কোন বিষয়ে, যা একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে শ্রবণ করা ছাড়া জানার উপায় নেই। তাহলে সে কথাকে হুকুমগত ভাবে মারফূ‘ ধরা হবে।

২. মাওকূফ (الموقوف) : যে হাদীছের সানাদ ছাহাবী পর্যন্ত পৌঁছে, সে হাদীছকে মাওকূফ হাদীছ বলা হয়।

৩. মাক্বতূ‘ (المقطوع) : যে হাদীছের সানাদ তাবেঈ পর্যন্ত পৌঁছে, সে হাদীছকে মাকতূ‘ বলা হয় ।

দু’টি সতর্কতা :

(ক) মুরসাল হাদীছ এবং মাক্বতূ‘ হাদীছ এক নয়। তাবেঈ যে হাদীছটা সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করে বলেন, সে হাদীছকে মুরসাল বলা হয়। পক্ষান্তরে তাবেঈর নিজস্ব কথা বা ফৎওয়াকে মাক্বতূ‘ হাদীছ বলা হয়।

উদাহরণ : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব একজন তাবেঈ। তিনি কোন ছাহাবীর নাম উল্লেখ করা ছাড়াই সরাসরি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, '...'। এই হাদীছকে মুরসাল হাদীছ বলা হবে। পক্ষান্তরে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ)-এর কোন ছাত্র বলেন, সায়িদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, '...'। তাবেঈর এই ফৎওয়া বা কথাকে উছূলে হাদীছের পরিভাষায় মাক্বতূ' হাদীছ বলা হয়।

(খ) মাক্বতূ' হাদীছ ও মুনক্বাতে' হাদীছ এক নয়। মাক্বতু' মাতনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। যে মাতন কোন তাবেঈর ফৎওয়া বা কথা তাকে মাক্বতূ' বলা হয়। পক্ষান্তরে মুনক্বাতে' সানাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। যে সানাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে, তাকে মুনক্বাতে' বলা হয়। মারফূ' হাদীছ যেমন মুনক্বাতে' হতে পারে, তেমনি মুরসাল হাদীছ মুনক্বাতে' হতে পারে। মাক্বতূ' হাদীছও মুনক্বাতে হতে পারে।

উদাহরণ : মনেকরি, মুযাফফর একজন রাবী। তিনি বলেন, আমাকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেছেন, তাকে হাসান বাছরী (রহঃ) বলেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ...। এই হাদীছটি একজন তাবেঈ রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই হাদীছটি একটি মুরসাল হাদীছ। কিন্তু অত্র হাদীছের মুযাফফর ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ এ দু'জনের মাঝে কোন দিন সাক্ষাৎ হয়নি। এমনকি মুযাফফরের যখন জন্ম হয়, তার অনেক আগেই শাহ ওয়ালিউল্লাহ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। সুতরাং এই মুরসাল হাদীছটি মুনক্বাতে'।

এমনিভাবে অত্র উদাহরণে যদি আমরা হাসান বাছরীর পর 'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন' এই কথাটা উঠিয়ে দিয়ে বলি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন, হাসান বাছরী বলেছেন, '...' তাহলে হাদীছটি একটি মাক্বতূ' হাদীছে পরিণত হবে। কেননা এটা এখন একজন তাবেঈর কথা। কিন্তু অত্র হাদীছে শাহ ওয়ালিউল্লাহ কোন দিন হাসান বাছরীকে দেখেননি; বরং হাসান বাছরীর মৃত্যুর বহু দিন পরে শাহ ওয়ালিউল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই মাক্বতূ' হাদীছটি মুনক্বাতে' বা বিচ্ছিন্ন।

নোট : হাদীছে মাওকূফ ও মাক্বতূ'কে একসাথে 'আছার' বলা হয়। উল্লেখ্য যে, অতীত যুগের অনেক মুহাদ্দিছ হাদীছে মারফূ'কেও আছার বলেছেন। যেমন : ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন 'শারহু মা'আনিল আছার' তথা আছারসমূহের অর্থের ব্যাখ্যা। অত্র বইয়ে তিনি মারফূ', মাওকূফ ও মাক্বতূ' সবরকম হাদীছ নিয়ে এসেছেন। সুতরাং তাঁর নিকটে সকল হাদীছই আছার।

মাওকূফ ও মাক্বতূ' হাদীছের কিতাব :

সালাফে ছালেহীনের সংকলিত অনেক কিতাব রয়েছে, যেগুলোতে তারা ছাহাবী ও তাবেঈগণের আছার জমা করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

(১) মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা (২) মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ও (৩) তাফসীরে ত্বাবারী।

চতুর্থ অধ্যায়
(باب الرابع)
কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
(المعلومات الهامة)

হাদীছ গ্রন্থসমূহের প্রকারভেদ :

হাদীছের কিতাবগুলো মোট ১২টি ভাগে বিভক্ত। যেমন : ১. জামে‘ ২. সুনান ৩. মুছান্নাফ ৪. মুস্তাদরাক ৫. মুস্তাখরাজ ৬. মুসনাদ ৭. মু‘জাম ৮. যাওয়ায়েদ ৯. জুয ১০. ইলাল ১১. তাখরীজ ও ১২. আত্বরাফ। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হল :

(১) জামে‘ (الجامع)-এর পরিচয় :

জামে‘-এর সংজ্ঞায় আমরা সহজে বলতে পারি, ইনসাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোষ। অর্থাৎ ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা যে কিতাবে সন্নিবেশিত থাকে, তাকে জামে‘ গ্রন্থ বলা হয়। ঈমান থেকে শুরু করে ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েলসহ রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী, ইতিহাস, তাফসীর, ক্বিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত ফিৎনা-ফাসাদ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা যে গ্রন্থে করা হয় তাকে জামে‘ বলা হয়।

উদাহরণ : কুতুবে সিত্তাহ্র মধ্যে দু’টি গ্রন্থ জামে‘ হিসাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। (১) জামে‘ আল-বুখারী ও (২) জামে‘ আত-তিরমিযী।

(২) সুনান (السنن)-এর পরিচয় :

যে গ্রন্থে হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত হাদীছ ফিক্বহী অধ্যায় অনুযায়ী সাজানো হয় সে গ্রন্থকে ‘সুনান’ বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ- ফিক্বহী অধ্যায় অনুযায়ী সাজানো বলতেই আমরা মনে করি, ফিক্বহের বইগুলো যেভাবে সাজানো হয়েছে, সেভাবে সাজানো। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। সত্যি বলতে কি ফিক্বহের বইগুলো অস্তিত্বে আসার অনেক আগেই মুহাদ্দিছগণ তাদের বইকে ফিক্বহী অধ্যায় অনুযায়ী সাজিয়েছেন। সুতরাং ফিক্বহী অধ্যায় অনুযায়ী সাজানোর এই ধরণ মুহাদ্দিছগণই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে ফিক্বহী বইগুলোর লেখকগণ তাদের নিকট থেকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ফিক্বহী অধ্যায় আকারে সাজানো বইগুলো সাধারণত পবিত্রতার আলোচনা দিয়ে শুরু হয় এবং ক্রয়-বিক্রয় বা হুদূদ বা শিষ্টাচার-এর আলোচনা দিয়ে শেষ হয়।

উদাহরণ : সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ প্রভৃতি।

(৩) মুছান্নাফ (المصنف)-এর পরিচয় :

যে গ্রন্থটি ফিক্বহী অধ্যায় আকারে সাজানো হয় তাকে মুছান্নাফ বলে। সুনান ও মুছান্নাফ-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সুনান গ্রন্থগুলোতে শুধু মারফূ‘ হাদীছ তথা রাসুল (ছাঃ)-এর হাদীছ জমা করা হয়েছে। অন্যদিকে মুছান্নাফ গ্রন্থগুলোতে মাওকূফ ও মাক্বতূ‘ হাদীছ তথা ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবে-তাবেঈগণের ফৎওয়াও জমা করা হয়েছে।

উদাহরণ : মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা।

(৪) মুস্তাদরাক (المستدرك)-এর পরিচয় :

মুস্তাদরাক শব্দটি ইস্তিদরাক ক্রিয়ামূল থেকে উৎপন্ন। ‘ইস্তিদরাক’-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, সংস্কার করা, সংশোধন করা। অন্যভাবে বলা যায়, কোন প্লানের অবাস্তবায়িত অংশগুলোকে বাস্তবায়ন করা। পারিভাষিক অর্থে, হাদীছের

গ্রন্থগুলোর কোন একজন সংকলক তাদের বইয়ে যে ধরনের হাদীছ সংকলন করতে চেয়েছিলেন, সে ধরনের সকল হাদীছ তিনি জমা করতে পারেননি; বরং তার পরিকল্পনার অনুরূপ আরো অনেক হাদীছ বাকী থেকে গেছে। পরবর্তীতে কোন সংকলক এসে ছুটে যাওয়া হাদীছগুলোকে জমা করেন এবং বইয়ের নাম দেন মুস্তাদরাক।

উদাহরণ : মুস্তাদরাকে হাকেম। অত্র গ্রন্থটি ইমাম হাকেম ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের ইস্তিদরাক করে লিখেছেন। অর্থাৎ তিনি এই বইয়ে ঐ সমস্ত হাদীছ জমা করেছেন, যেগুলো ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

নোট : ইমাম হাকেম তাঁর অত্র বইয়ে অনেক হাদীছকে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলেছেন, কিন্তু বাস্তবে সেগুলো ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের শর্তে ছহীহ নয়। পরবর্তীতে ইমাম যাহাবী তাঁর বইয়ের উপর তালখীছ লিখেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত দানের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরও অনেক ভুল হয়ে যায়। বর্তমান যুগের মুহাদ্দিছ শায়খ আবু ইসহাক আল-হুয়াইনী উভয় ইমামের সিদ্ধান্তের উপর তাহক্বীক্ব করে এই বিষয়ে ‘ইত্তিহাফুন নাক্বিম’ নামে চমৎকার একটি বই উপহার দিয়েছেন।

(৫) মুস্তাখরাজ (المستخرج)-এর পরিচয় :

হাদীছের কোন গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছগুলোকে মূল সংকলকের সানাদ ছাড়া অন্য সানাদে বর্ণনা করা। ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছগুলোকে কোন মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারীর সানাদ ছাড়া নিজ সানাদে সংকলন করলে তাকে ‘মুস্তাখরাজ’ বলা হবে।

উপকারিতা :

এই জাতীয় গ্রন্থগুলোর ফলে অন্য নতুন সানাদ পাওয়ার কারণে হাদীছ আরো মযবূত হয়। মূল গ্রন্থে হাদীছের কোন ইবারত ছুটে গিয়ে থাকলে অত্র মুস্তাখরাজে তা চলে আসে। মূল গ্রন্থে কোন রাবী তার শায়খ থেকে শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার না করে থাকলে অনেক সময় মুস্তাখরাজে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে থাকে। এককথায় মূল গ্রন্থে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে মুস্তাখরাজ গ্রন্থে তা স্পষ্ট হয়।

(৬) মুসনাদ (المسند)-এর পরিচয় :

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর নামের উপর ভিত্তি করে যে গ্রন্থ সাজানো হয়, তাকে মুসনাদ বলা হয়। তথা সংকলক সর্বপ্রথম আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছগুলো জমা করলেন তারপর আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছগুলো- এভাবে ছাহাবীগণের নাম অনুযায়ী হাদীছ জমা করা হয় মুসনাদ গ্রন্থগুলোতে।

উদাহরণ : ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর সংকলিত মুসনাদে আহমাদ।

নোট : মুসনাদ গ্রন্থগুলোতে ছাহাবীগণের নাম অনুযায়ী হাদীছ সাজানোর ধরণটা বিভিন্ন রকম হয়। কোন সংকলক ছাহাবীগণের মর্যাদাভেদে তাঁদের নাম সাজান। যেমন : প্রথমে খোলাফায়ে রাশেদীনের বর্ণিত হাদীছ, তারপর আশারায়ে মুবাশশারা বর্ণিত হাদীছ- এভাবে কিতাবকে সাজান। কোন মুহাদ্দিছ আরবী বর্ণের ক্রমধারা অনুযায়ী ছাহাবীগণের নামকে সাজান।

(৭) মু‘জাম (المعجم)-এর পরিচয় :

যে গ্রন্থে উস্তাদগণের নাম অনুযায়ী হাদীছ সাজানো হয়, তাকে মু‘জাম বলা হয়। অর্থাৎ কোন মুহাদ্দিছ তাঁর একেকজন করে শায়খের নাম উল্লেখ করেন এবং তারপর সে শায়খ থেকে যত হাদীছ শুনেছেন সবগুলো বর্ণনা করেন।

উদাহরণ : ইমাম ত্বাবারানী সংকলিত আল-মু‘জামুল কাবীর।

(৮) যাওয়ায়েদ (الزوائد)-এর পরিচয় :

যে গ্রন্থে নির্দিষ্ট কিছু গ্রন্থের তুলনায় অন্য নির্দিষ্ট কিছু গ্রন্থে বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীছগুলোকে আলাদা করে জমা করা হয়, তাকে 'যাওয়ায়েদ' বল হয়। যেমন কোন গ্রন্থে মুসনাদে আহমাদের ঐ সমস্ত হাদীছকে আলাদা করে জমা করা হল, যেগুলো কুতুবে সিত্তাহতে নেই, তখন এই গ্রন্থকে যাওয়ায়েদ বলা হবে।

উদাহরণ : ইমাম হায়ছামী প্রণীত মাজমাউয যাওয়ায়েদ। অত্র বইয়ে তিনি মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবু ইয়া'লা ও ইমাম ত্বাবারাণীর আল-মু'জামুল কাবীর, ছগীর ও আওসাত্ব গ্রন্থের ঐ সমস্ত অতিরিক্ত হাদীছ জমা করেছেন, যেগুলো কুতুবে সিত্তাহতে নেই।

(৯) জুয (الجزء)-এর পরিচয় :

যে গ্রন্থে নির্দিষ্ট কোন মাসআলার উপর হাদীছ জমা করা হয়, তাকে জুয বলা হয়।

উদাহরণ : ইমাম বুখারীর জুয রফঈল ইয়াদায়ন। অত্র গ্রন্থে তিনি শুধু রফউল ইয়াদায়ন সম্পর্কিত হাদীছগুলোকে জমা করেছেন।

(১০) ইলাল (العلل)-এর পরিচয় :

যে গ্রন্থে হাদীছের গোপন ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে ইলাল বলা হয়।

উদাহরণ : ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ)-এর লিখিত ইলাল।

(১১) তাখরীজ (التخريج)-এর পরিচয় :

বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত সানাদবিহীন হাদীছগুলোর মৌলিক গ্রন্থগুলো থেকে রেফারেন্স দেয়াকে তাখরীজ বলা হয়।

উদাহরণ : দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়া- হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী।

(১২) আত্বরাফ (الأطراف)-এর পরিচয় :

আত্বরাফ একপ্রকার সূচীপত্র জাতীয় বই। এই জাতীয় বইয়ে সানাদসহ হাদীছের মূল অংশ উল্লেখ করে হাদীছটি কোন্ গ্রন্থের কত খণ্ডের কত পৃষ্ঠায় আছে তা বর্ণনা করা হয়।

উদাহরণ : তুহফাতুল আশরাফ- ইমাম মিযযী।

প্রসিদ্ধ কিছু কিতাব পরিচিতি

ছহীহায়ন : ছহীহায়ন বলতে সর্বদা ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম বুঝানো হয়ে থাকে। ছহীহ বুখারী হচ্ছে আসমানের নীচে পবিত্র কুরআনের পরে সর্ববিশুদ্ধ কিতাব।

(ক) ছহীহ বুখারী (صحيح البخاري)-এর পরিচয় :

পূর্ণনাম : আল-জামিউল মুসনাদ আছ-ছহীহ আল-মুখতাছার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ ও সুনানিহি ও আইয়ামিহি(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه)। এর প্রসিদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে 'ছহীহ বুখারী'।

লেখকের নাম : আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী।

মোট হাদীছ সংখ্যা : ছহীহ বুখারীতে পুনরাবৃত্তি হাদীছ ছাড়া ২৭৬১টি হাদীছ রয়েছে এবং পুনরাবৃত্তি হাদীছ সহ রয়েছে প্রায় সাত হাযার হাদীছ।

ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ : ছহীহ বুখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ হচ্ছে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী প্রণীত 'ফাৎহুল বারী'। এছাড়া আরো রয়েছে। যেমন :

(১) উমদাতুল ক্বারী (عمدة القاري) -আল্লামা আইনী।
(২) ইরশাদুস সারী (إرشاد الساري)- ইমাম ক্বাসত্বলানী।
(৩) ফাৎহুল বারী (فتح الباري)- ইমাম ইবনু রজব।
(৪) ফায়যুল বারী (فيض الباري)- আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী

(খ) ছহীহ মুসলিম (صحيح المسلم)-এর পরিচয় :

পূর্ণনাম : আল-মুসনাদ আছ-ছহীহ (المسند الصحيح)। সংক্ষিপ্ত ও প্রসিদ্ধ নাম 'ছহীহ মুসলিম'।

লেখকের নাম : ইমাম হাফেয আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (২০৪-২৬১ হিঃ)।

মোট হাদীছ সংখ্যা : পুনরাবৃত্তি হাদীছ ছাড়া প্রায় ৪ হাযার।

ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ : ছহীহ মুসলিমের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম নববী প্রণীত 'আল-মিনহাজ'। এছাড়া আরো রয়েছে। যেমন :

(১) ইকমালুল মু'লিম (إكمال المعلم)- কাযী ইয়ায।
(২) আদ-দীবাজ 'আলা ছহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ (الديباج علي صحيح مسلم بن الحجاج) - ইমাম সুয়ূত্বী।
(৩) আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ (السراج الوهاج)-ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী।

'সুনানে আরবা'আ' (سنن الأربعة)-এর পরিচয় :

সুনানে আরবা'আ বলতে হাদীছের প্রসিদ্ধ ৪টি গ্রন্থকে বুঝানো হয়ে থাকে। সেগুলো হচ্ছে সুনানে আবুদাঊদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনু মাজাহ।

সুনানে আবুদাঊদ (سنن أبي داود)-এর পরিচয় :

পূর্ণনাম : কিতাবুস সুনান।

লেখকের নাম : ইমাম আবুদাঊদ সুলায়মান ইবনু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (২০২-২৭৫ হিঃ)।

মোট হাদীছ সংখ্যা : ৫২৭৬টি ।

ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ : সুনান আবুদাঊদের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম শামসুল হক্ব আযীমাবাদী প্রণীত 'আউনুল মা'বূদ'। এছাড়াও রয়েছে,

(১) মা'আলিমুস সুনান (معالم السنن)- ইমাম খত্তাবী ।
(২) মিরক্বাতুস ছুঊদ (مرقاة الصعود)- ইমাম সুয়ূত্বী।
(৩) বাযলুল মাজহূদ (بذل المجهود)- মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী।

'সুনানে নাসাঈ' (سنن النسائي)-এর পরিচয় :

পূর্ণনাম : আস-সুনানুল কুবরা। এর সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে 'আল-মুজত্বা'।

লেখকের নাম : ইমাম আবু আব্দির রহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব ইবনু আলী আন-নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ)।

মোট হাদীছ সংখ্যা : ৫৭৭৬ টি।

ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ :

(১) যাহরুর রুবা আলাল মুজত্বা (ظهر الربي علي المجتبي)- ইমাম সুয়ূত্বী।
(২) হাশিয়াতুস সানাদী আলান নাসাঈ (حاشية السندي علي النسائ)- সিন্ধী।
(৩) শারহু সুনানিন নাসাঈ (شرح سنن النسائ)- ইয়াহইয়া ইয়ামানী।

সুনানে তিরমিযী (سنن الترمذي)-এর পরিচয় :

পূর্ণনাম : আল জামে'।

লেখকের নাম : আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনু সাওরা আত-তিরমিযী (মৃত ২৭৯ হিঃ)।

হাদীছের সংখ্যা : ৪৪১৫টি।

ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ : প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম আব্দুর রহমান আল-মুবারকপুরী প্রণীত 'তুহফাতুল আহওয়াযী'। এছাড়াও রয়েছে,

(১) 'আরেযাতুল আহওয়াযী (عارضة الأحوذي)- ইবনুল আরাবী আল মালেকী।
(২) শারহু সুনানিত-তিরমিযী (شرح سنن الترمذي)- ইবনি সাইয়্যিদিন নাস।

হাফেয ইরাকী ও ইমাম আবু যুরআ'র প্রণীত ব্যাখ্যা।

সুনানে ইবনু মাজাহ (سنن ابن ماجة)-এর পরিচয় :

পূর্ণনাম : আস-সুনান।

লেখকের নাম : আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ (মৃত ২৭৩ হিঃ)।

মোট হাদীছ সংখ্যা : ৪৪৮৫টি।

ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ : হাশিয়া সিন্ধী, তা'লীক্বাত সুয়ূত্বী।

একটি ভুল ধারণা :

আমাদের সমাজে 'ছিহাহ সিত্তাহ' নামে একটি কথা প্রচলিত আছে। ছিহাহ সিত্তাহ অর্থ হচ্ছে- ছয়টি ছহীহ কিতাব। উপরে বর্ণিত ছয়টি কিতাবকে একত্রে 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা হয়ে থাকে। উক্ত গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ হাদীছ ছহীহ হওয়ায় 'ছিহাহ সিত্তাহ' নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু অত্যধিক প্রচলনের ফলে অনেক মানুষ মনে করে থাকে, অত্র ছয়টি বইয়ের সব হাদীছই ছহীহ, যা একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। সেজন্য আমাদের উচিৎ 'ছিহাহ সিত্তাহ' না বলে 'কুতুবে সিত্তাহ' বলা।

হাদীছের বইগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ :

হাদীছের প্রসিদ্ধ বইগুলোর জন্য পরিচিত কিছু আক্ষরিক সংকেত ব্যবহার করা হয়। একজন হাদীছের ছাত্রের জন্য এই সংকেতগুলো মনে রাখা যরূরী।

কুতুবে সিত্তাহ	ع
সুনানে আরবাআ	عه أو 4
ছহীহ বুখারী	خ
ছহীহ মুসলিম	م
সুনানে নাসায়ী	ن أو س
সুনানে তিরমিযী	ت
সুনানে আবু দাউদ	د
সুনানে ইবনে মাজাহ	ق أو ج أو جه

কতিপয় মুহাদ্দিছের মৃত্যু তারিখ :

একজন মানুষকে চেনার জন্য অন্ততঃপক্ষে এতটুকু জানা দরকার যে, তিনি কোন্ যুগে বাস করতেন। আমরা যারা ইসলামী বিষয়ে পড়াশোনা করি তারা অনেক আলেমের নাম পড়ি, অনেক মুহাদ্দিছের নাম শুনি। কিন্তু তাঁদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ না জানার দরুণ আমরা বুঝতে পারি না তিনি আসলে কোন্ যামানার আলেম ছিলেন। প্রতিটি ছাত্রের জন্য প্রসিদ্ধ আলেম-ওলামার জন্ম সাল না হলেও মৃত্যু সাল অবশ্যই মনে রাখা উচিত। নীচে প্রখ্যাত কতিপয় ছাহাবীসহ বিভিন্নযুগের প্রসিদ্ধ কিছু হাদীছ বিশারদগণের মৃত্যুসাল উল্লেখ করা হল :

ছাহাবীগণ : ১. আবুবকর (রাঃ) ১৩ হিঃ। ২. ওমর (রাঃ) ২৩ হিঃ। ৩. ওছমান (রাঃ) ৩৫ হিঃ। ৪. আলী (রাঃ) ৪০ হিঃ। ৫. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ৩২ হিঃ। ৬. আয়েশা (রাঃ) ৫৭ হিঃ। ৬. আবু হুরায়রা (রাঃ) ৫৯ হিঃ। ৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ৬৮ হিঃ। ৮. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ৭৩ হিঃ। ৯. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) ৯৩ হিঃ।

ইমাম ও মুহাদ্দিছগণ : ১০. সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রহঃ) ৯৪ হিঃ। ১১. ওমর ইবনু অব্দুল আযীয (রহঃ) ১০১ হিঃ। ১২. হাসান বাছরী (রহঃ) ১১০ হিঃ। ১৩. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) ১১০ হিঃ। ১৪. ইমাম যুহরী (রহঃ) ১২৪ হিঃ। ১৫. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ১৫০ হিঃ। ১৬. ইমাম আওযাঈ (রহঃ) ১৫৬ হিঃ। ১৭. ইমাম শু‘বা (রহঃ) ১৬০ হিঃ। ১৮. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ১৬১ হিঃ। ১৯. ইমাম মালেক (রহঃ) ১৭৯ হিঃ। ২০. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) ১৮১ হিঃ। ২১. ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান ১৯৮ হিঃ। ২২. ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ২০৪ হিঃ। ২৩. ইমাম আব্দুর রাযযাক ২১১ হিঃ। ২৪. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ২৩৩ হিঃ। ২৫. আলী ইবনুল মাদীনী ২৩৪ হিঃ। ২৬. ইবনু আবী শায়বা ২৩৫ হিঃ। ২৭. ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ (রহঃ) ২৩৮ হিঃ। ২৮. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) ২৪১ হিঃ। ২৯. ইমাম দারেমী (রহঃ) ২৫৫ হিঃ। ৩০. ইমাম বুখারী (রহঃ) ২৫৬ হিঃ। ৩১. ইমাম যুহলী (রহঃ) ২৫৮ হিঃ। ৩২. ইমাম মুসলিম (রহঃ) ২৬১ হিঃ। ৩৩. ইমাম ইজলী (রহঃ) ২৬১ হিঃ। ৩৪. ইমাম আবু যুর‘আ রাযী (রহঃ) ২৬৪ হিঃ। ৩৫. ইবনু মাজাহ (রহঃ) ২৭৩ হিঃ। ৩৬. ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) ২৭৫ হিঃ। ৩৭. ইমাম আবু হাতিম রাযী ২৭৭ হিঃ। ৩৮. ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ২৭৯ হিঃ। ৩৯. ইবনু আবিদ দুনইয়া (রহঃ) ২৮১ হিঃ। ৪০. ইমাম বাযযার ২৯২ হিঃ। ৪১. ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ৩০৩ হিঃ। ৪২. ইমাম জারীর ত্বাবারী (রহঃ) ৩১০ হিঃ। ৪৩. ইবনু খুযায়মা (রহঃ) ৩১১ হিঃ। ৪৪. ইমাম ত্বহাবী (রহঃ) ৩২১ হিঃ। ৪৫. ইমাম উক্বায়লী ৩২২ হিঃ। ৪৬. ইবনু আবি হাতিম ৩২৭ হিঃ। ৪৭. ইমাম ইবনু হিব্বান ৩৫৪ হিঃ। ৪৮. ইমাম ইস্পাহানী (রহঃ) ৩৫৬ হিঃ। ৪৯. ইমাম ত্বাবারাণী (রহঃ) ৩৬০ হিঃ। ৫০. ইবনু আদী ৩৬৫ হিঃ। ৫১. ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) ৩৮৫ হিঃ। ৫২. ইমাম

হাকিম (রহঃ) ৪০৫ হিঃ। ৫৩. ইমাম লালকাঈ ৪১৮ হিঃ। ৫৪. ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) ৪৫৬ হিঃ। ৫৫. ইমাম বায়হাক্বী ৪৫৮ হিঃ। ৫৬. খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) ৪৬৩ হিঃ। ৫৭. ইমাম হুমায়দী ৪৮৮ হিঃ। ৫৮. ইমাম দায়লামী ৫০৯ হিঃ। ৫৮. ইমাম বাগাভী ৫১৬ হিঃ। ৫৯. কাযী ইয়ায ৫৪৪ হিঃ। ৬০. ইবনু আসাকির ৫৭১ হিঃ। ৬১. ইবনুল জাওযী (রহঃ) ৫৯৭ হিঃ। ৬২. আব্দুল গনী মাক্বদেসী (রহঃ) ৬০০ হিঃ। ৬৩. ইবনুল আছীর (রহঃ) ৬০৬ হিঃ। ৬৪. ইমাম ইবনুছ ছালাহ ৬৪৩ হিঃ। ৬৫. ইমাম মুনযিরী ৬৫৬ হিঃ। ৬৬. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) ৬৭১ হিঃ। ৬৭. ইমাম নববী (রহঃ) ৬৭৬ হিঃ। ৬৮. ইবনু দাক্বীক্ব আল-ঈদ ৭০২ হিঃ। ৬৯. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ৭২৮ হিঃ। ৭০. ইমাম মিযযী (রহঃ) ৭৪২ হিঃ। ৭১. আল্লামা ত্বীবী ৭৪৩ হিঃ। ৭২. ইবনুত তুরকমানী (রহঃ) ৭৪৫ হিঃ। ৭৩. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ৭৫১ হিঃ। ৭৪. ইমাম যায়লাঈ (রহঃ) ৭৬২ হিঃ। ৭৫. ইবনু কাছীর (রহঃ) ৭৭৪ হিঃ। ৭৬. ইবনু রজব (রহঃ) ৭৯৫ হিঃ। ৭৭. হাফেয ইরাকী ৮০৬ হিঃ। ৭৮. ইমাম মুনাবী (রহঃ) ৮০৩ হিঃ। ৭৯. ইমাম হায়ছামী (রহঃ) ৮০৭ হিঃ। ৮০. আল্লামা জুরজানী ৮১৬ হিঃ। ৮১. ইমাম বুওইসিরী (রহঃ) ৮৪০ হিঃ। ৮২. ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ৮৫২ হিঃ। ৮৩. আল্লামা আঈনী (রহঃ) ৮৫৫ হিঃ। ৮৪. ইবনুল হুমাম (রহঃ) ৮৬১ হিঃ। ৮৫. ইমাম সাখাবী (রহঃ) ৯০২ হিঃ। ৮৬. ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) ৯১১ হিঃ। ৮৭. তাহের পাট্টানী ৯৮৬ হিঃ। ৮৮. মোল্লা আলী কারী ১০১৪ হিঃ। ৮৯. যারকানী ১১২২ হিঃ। ৯০. ছান'আনী (রহঃ) ১১২৮ হিঃ। ৯১. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) ১২০৬ হিঃ। ৯২. ইমাম শাওকানী (রহঃ) ১২৫৫ হিঃ। ৯৩. ইমাম আজলূনী ১১৬২ হিঃ। ৯৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী ১১৭৬ হিঃ। ৯৫. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) ১৩০৪ হিঃ। ৯৬. মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) ১৩২০ হিঃ। ৯৭. আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) ১৩২৯ হিঃ। ৯৮. আল্লামা আলূসী (রহঃ) ১৩৪২ হিঃ। ৯৯. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) ১৩৫২ হিঃ। ১০০. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) ১৩৫৩ হিঃ। ১০১. আহমাদ শাকের (রহঃ) ১৩৭৭ হিঃ। ১০২. আল্লামা শানক্বীতী ১৩৯৩ হিঃ। ১০৩. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) ১৪২০ হিঃ। ১০৪. শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ১৪২০ হিঃ। ১০৫. শায়খ উছাইমীন (রহঃ) ১৪২১ হিঃ। ১০৬. শায়খ মুক্বিল ইবনু হাদী আল ওয়াদেঈ ১৪২২ হিঃ। ১০৭. শায়খ যুবায়র আলী যাঈ (রহঃ) ১৪৩৪ হিঃ।

জীবিত শ্রেষ্ঠ কিছু মুহাদ্দিছের নাম :

(১) আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ -সঊদী আরব। (২) আবু ইসহাক আল-হুয়াইনী -মিশর। (৩) শায়খ শু'আইব আল-আরনাঊত -সিরিয়া। (৪) শায়খ মুছত্বফা আজমী -ভারত। (৫) তারেক ইবনু আওজুল্লাহ। (৬) শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারী -পাকিস্তান। (৭) শায়খ হাতিম আল-আওনী। (৮) ড. মাহমূদ আত-ত্বাহ্হান -কুয়েত। (৯) মুফতী হাবীবুর রহমান আজমী -ভারত। (১০) শায়খ যিয়া আজমী- ভারত।

আলহামদুলিল্লাহিল্লা-যি ওয়াফফাক্বানা। ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবিয়্যিনা।

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ان لا إله الا انت استغفرك واتوب إليك

***